যিনি

উন্নতিবিমুখ নহেন অথচ হিন্দু,

যিনি

স্বদেশানুরাগী এবং মাতৃভাষার সমাদর করেন,

যাঁহার

কর্ত্তব্যকর্ম্মে জ্বলন্ত উৎসাহ আছে এবং অকর্ত্তব্যে মতি নাই,

যাঁহার

হিন্দুধর্ম্মসুলভ ভক্তি, দয়া, পবিত্রতা ও পরোপকারেচ্ছা আছে,

তাঁহারই

করকমলে আমার এই ক্ষুদ্রপুস্তক

সাদরে অর্পণ করিলাম।

সূচীপত্র।

—oo—

(উপক্রমণিকা।)

(প্রথম খণ্ড।)

(দ্বিতীয় খণ্ড।)

প্রস্তাবনা।

(সম্পাদকের লেখা।)

পরের জিনিস আপনার বলিয়া লোককে ভাবিতে দেওয়া উচিত নয়; সেই জন্য এই স্থানেই বলা আবশ্যক যে আমি এ পুস্তকের রচয়িতা নহি, রচয়িতা ইহার আর এক জন—আমি ইহার সম্পাদক মাত্র।

প্রায় এক বৎসর হইল, একদিন বৈকালে আমি কলিকাতায় আমাদের বাড়ীতে বসিয়া আছি, অমৃত বাবু তথায় আসিলেন। তিনি বয়সে আমা অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও আমার পরম বন্ধু। বহু দিবস তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই, কারণ আমি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে ছিলাম। অমৃতবাবু আসিয়া বলিলেন—

'কি ভাই! ভাল আছ ত? তুমি বাড়ী আসিয়াছ শুনিয়া তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলাম।'

আমি বলিলাম—

'হাঁ ভাল আছি—বাড়ী আসিয়া অবধি আপনার সহিত দেখা করিতে যাইব মনে করিতেছি, কিন্তু যাইতে পারি নাই। আপনারা পল্লীগ্রামের লোক বেশ্—মহুনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত যে সাক্ষাৎ করিয়াছেন—ইহাতে বড়ই প্রীত হইলাম। ভোলাদাদা ভাল আছেন? আর সুমতি ভাল আছে ত?'

অমৃতবাবু বলিলেন 'সকলেই ভাল আছে, নহিলে আমি কি আজ আসিতে পারি ?'

তার পর কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে দুইজনে বেড়াইতে গেলাম— বেড়াইতে বেড়াইতে দুজনে কত কথাই হইল। অনেক দিনের পর অমৃত বাবুর সহিত সে দিন দেখা হইয়াছিল, তাই কথা আর ফুরায় না। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"অমৃতবাবু! আমি পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছি ও অনেক লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি—কিন্তু আপনার জীবনে যেমন অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে—এমন কাহারও শুনি নাই। দেখুন কত লোক সামান্য কথা লইয়া পুস্তক লিখিতেছে—আপনি কেন স্বীয় জীবনের সেই ঘটনাগুলি লিখিয়া পুস্তকাকারে ছাপান্ না ?"

অমৃতবাবু বলিলেন, "আমার কি তেমন রচনা শক্তি আছে যে সে আশ্চর্য্য ঘটনা সমূহের উপযুক্ত বর্ণনা করিতে পারি ?"

আমি তাঁহার সে আপত্তি শুনিলাম না—বুঝাইলাম রচনা-মাধুর্য্যে কাজ নাই, যেরূপ সহজ ভাষায় আমরা কথা কহি সেইরূপ ভাষায় লিখিলেই অনেকে পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবে।

শেষে অমৃতবাবু লিখিতে সম্মত হইলেন। এই কথার প্রায় এক বৎসর পরে তিনি একখানি বাঁধান খাতা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—

"ইহাতে তুমি যাহা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলে তাহাই লেখা আছে। রোজেনহাম্ নামে আমাদের সময়ে হিন্দুকলেজে একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রত্যহ 'ডায়েরী' লেখা অভ্যাস করান্। কলেজ সে ছাড়িয়াও অভ্যাস আমি

রাখিয়াছি। সেই ডায়েরী ও ভোলাদাদার নোটবুকই আমার এই জীবনচরিতের মূল। তোমার যদি পড়িয়া ভাল বোধ হয় তবেই ইহা ছাপাইও—না হয় অগ্নিসাৎ করিও।”

বৃদ্ধ চলিয়া গেলে আমি তিনবার ঐ খাতা আদ্যোপান্ত পড়িলাম, প্রতিবারেই মনে হইল—মনুষ্যজীবনে যাহা ঘটে তাহা উপন্যাস লিখিত কথা অপেক্ষা অদ্ভুত।

এক একটী লোক আছে তাহারা জীবনে কোন বৃহৎ কার্য্য না করিলেও পরিচিত সকলের প্রিয় হয়—তাহাদের কি এক রকম কোমলতা ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য আছে যে তাহাদের সহিত কথা কহিয়া তাহাদের কাছে থাকিয়া সকলেই তৃপ্তি লাভ করে—দূরে থাকিয়া তাহাদের কথা ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। অমৃতবাবু সেইরূপ লোক। আশা করি তাঁহার সহিত পরিচয়ে পাঠকগণও প্রীত হইবেন।

এই জীবনচরিতে পল্লীগ্রামের অনেক প্রকৃত চিত্র আছে—এই জন্য তিনি ইহার নাম দিয়াছেন, ‘পল্লীগ্রাম।’

কিন্তু ইহার অপর নামের তাৎপর্য্য কি? অনেক ভাবিলাম কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ‘হিন্দুধর্ম্মের মহিমা?’ —অমৃতবাবু তাহার পুস্তকে এই নামটী দিয়া বুঝি ভাল করেন নাই। আজ কাল এমন লোক অনেক দেখিতে পাই যাহারা হিন্দু সন্তান হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। আবার অনেকে শুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম কেন ধর্ম্ম নামেই নারাজ। এই দুই শ্রেণীর লোক হয়ত ‘হিন্দুধর্ম্মের মহিমা’ নাম শুনিয়াই এ এ পুস্তক স্পর্শ করিবেন না। এই কথা বুঝাইবার জন্য পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে একদিন প্রাতে হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া মনু-

নগরের টিকিট কিনিলাম—অমৃত বাবুর বাড়ীতে গিয়া এই সন্দেহের কথা বলাতে তিনি উত্তর দিলেন—

"আমিও ভাবিয়াছিলাম এই ক্ষুদ্রজীবনচরিতে ধর্ম্মের কথা লিখিব কি না। কিন্তু সে কথা না লিখিলে আমার প্রকৃত জীবনচরিত লেখা হয় না, এবং এই পুস্তকে লিখিত অনেক ঘটনার যথার্থ কারণও গোপন করিতে হয়। আর তুমি যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বলিলে (যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা ধর্ম্ম নামেই নারাজ) তাঁহারাও চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান বিনা হিন্দুস্থানের উন্নতি নাই।

"হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা নিরাশা ও উদ্যমহীনতায়, শিষ্টাচার ও অযথানিন্দাভাগিতায়, মহিমাবিচ্ছিন্ন আমার প্রৌঢ়াবস্থা সদৃশ। অনেক অনুসন্ধানের পর মহিমার সহিত আমার পুনর্মিলন হইয়াছে—হিন্দুসমাজ সেইরূপ আর্য্যধর্ম্মের অনুপমসুন্দর লুপ্তমহিমা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে কি? এই সামাজিক প্রশ্নের উত্তরদানে আমার জীবনকাহিনী কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে। সেই জন্য এই পুস্তকের অপর নাম "হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।"

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"মনুষ্য কেবল একখানি পুস্তক ভাল করিয়া লিখিতে পারে—নিজের জীবন-চরিত—" সেই জন্য আমি অমৃত বাবুকে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলি লিখিতে বলিয়াছিলাম। আমাদের পরিচিত অনেকেও

এসকল কথা শুনেন্ নাই কারণ তিনি বড়ই নির্জ্জনপ্রিয় ও অল্পভাষী। তাই সকলকে জানাইবার জন্য অমৃত বাবুর লিখিত এই পুস্তক ছাপাইলাম।

আমার কথা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণ! অমৃতবাবুর সহিত আপনাদের পরিচয় করিয়া দিলাম—এখন আপনারা বাল্যকাল হইতে সুখে দুঃখে তাঁহার সাথী হউন—আমি আপনাদের মঙ্গলকামনা করিয়া বিদায় লই।

নন্দনবাগান
২৩৯, অপ্যার সারকুলার রোড
৬ই আশ্বিন ১২৯৯।

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু





পল্লীগ্রাম।

অথবা

হিন্দুধর্ম্মের মহিমা।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

—o—

মন্নুনগর।—বাল্যকাল।

"My eyes are dim with childish tears
My heart is idly stirred,
For the same sound is in my ears
Which in those days I heard."

Wordsworth.

আমার ছেলেবেলার গুটিকতক কথা আগেই লিখি। সেগুলি না জানিলে আমার জীবনের যে সমস্ত ঘটনা লিখিতে বসিয়াছি তাহা বুঝা যাইবে না। ছেলেবেলার কথা অতি সংক্ষেপে লিখিব। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি—বৃদ্ধদের একটা রোগ

আছে ছেলেবেলার কথা বলিতে আরম্ভ করিলে মুখ কলের গাড়ির মত চলে—কেহ শুনুক আর নাই শুনুক, কিম্বা শুনিয়া যতই বিরক্ত হউক না কেন, তাঁহারা 'আমাদের ছেলেবেলায় এই ছিল,' 'তখনকার ছেলেরা এই ক'রত, আর এখনকার ছেলেরা কিনা……' ইত্যাদি কথা বলিয়া লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলেন। আমি বৃদ্ধ হইলেও সে দোষে দোষী হইব না, তবে যে কথা গুলি না বলিলে মূলঘটনা বুঝা যাইবে না তাহাই সংক্ষেপে লিখিব।

ভাগিরথীর পশ্চিমতীরে মন্নুনগর গ্রামে আমাদের বাড়ী এবং তথায় আমার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে। মন্নুনগর গ্রামটী বড় সুন্দর; আমাদের গ্রাম বলিয়া যে প্রশংসা করিতেছি তাহা নয়, অন্যগ্রামের লোক, এমন কি কলিকাতার অনেক বিশ্বনিন্দুক লোক পর্য্যন্ত আমাদের গ্রাম দেখিয়া বলিয়াছেন 'বড়ই সুন্দর গ্রাম'।

নির্ম্মল সলিলা ভাগিরথী মন্নুনগরের কোলে বাঁকিয়া গিয়াছে। মন্নুনগরের শ্যামসুন্দর ঘাটে দাঁড়াইলে এক অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। পার্শ্বে শ্যামসুন্দর মন্দির, সম্মুখে অপর পার্শ্বস্থ ঘন তরুরাজি যেন গঙ্গার জল হইতে উঠিয়াছে; দক্ষিণে হরিপুরের দূরস্থ সপ্তচূড় শিবমন্দির নদীর বক্রতাহেতু নিকটবর্ত্তী বোধ হয়। মাঝে মাঝে গ্রামে গ্রামে স্নানের ঘাট। গ্রাম হইতে ঘাটে আসিবার পথগুলি বৃক্ষশ্রেণীসম্মুখে দূর হইতে রেখার মত দেখাইতেছে—যেন অজগর সরীসৃপগণ বৃক্ষ হইতে নামিয়া গঙ্গার জলপান করিতেছে। কোথায় হৃষ্টপুষ্ট গাভীগণ সুখের পরাকাষ্ঠা হওয়াতে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে নবদূর্ব্বাদল চর্ব্বণ

করিতেছে, কোথায় শ্যামলবর্ণ মহিষগণ পূর্ণোদর হইয়া মাঠে মাঠে অন্যমনস্কে বিচরণ করিতেছে। ক্ষীণজীবী ব্রাহ্মণগণ হাতে পৈতা জড়াইয়া গঙ্গার ঘাটে মুখে ববম্ বলিয়া শিবপূজা করিতেছে এবং মনে মনে ঘোষেদের বাড়ীর নৈবিদ্যির কথা ভাবিতেছে। কোন ঘাটে বালিকাগণ সন্ধ্যার সময় মাটীর প্রদীপ জ্বালাইতেছে ও সকলে একস্বরে—

কুলকুলতি কুলে বাতি,
তব কূলে দিলাম বাতি:
বাপকুল—মামাকুল—শ্বশুরকুলে
পড়ে যেন সুখের ভাতি।

ইত্যাদি গান করিতেছে।

যদি পৃথিবীতে শান্তি থাকে তবে এই খানে আছে। এখানে খবরের কাগজের বিফল ক্রন্দন নাই, কার্য্যহীন বক্তার গগন-ভেদী কথার স্রোত নাই, বারবণিতার মুখে ধর্ম্মের কাহিনী নাই। আছে—'বৌকুথাকও' 'চোকগেল' 'ফটিকজল' প্রভৃতি পাখীর সুমধুর ধ্বনি, পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর জলপূর্ণ সুকোমল তনু, আর অল্পে তুষ্ট কৃষকপরিবারের ক্ষুদ্র আশা ও স্বাভাবিক প্রেম।

ছেলেবেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়া কেমন একটা আনন্দ হইত। কখনও দলেবলে যাইয়া কাহারও বাগানে নারিকেল কি আম্র পাড়িতাম (তখন আপন পর এত জ্ঞান ছিল না)—কখনও গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া, আপনারা নাচিয়া নৌকাকে নাচাইয়া, গান গাহিতে গাহিতে স্রোতের সঙ্গে কতদূর যাইতাম; কেহ হাল ধরিত, কেহ বা দাঁড় টানিত, সকলেই গান

গাইত। গানের সঙ্গে মানের বড় সম্পর্ক নাই—আর কোনটার অর্থ থাকিলেও তাহা তখন বুঝিতাম না; তথাপি পাখী যেমন নিজের গানের অর্থ না বুঝিয়া কেবল মনের আনন্দে গান গায়, হরিণশিশু যেমন না ভাবিয়া চিন্তিয়া হৃদয় উল্লাসে লাফাইয়া বেড়ায়, আমরাও তেমনি আপনার মনে গঙ্গাবক্ষে গান গাইতাম ও নৌকা চালাইতাম।

কেন জানি না ছেলে বেলা হইতে আমি নদীর জল ভালবাসি। প্রায়ই সকালে ও বৈকালে আমরা গঙ্গাতীরে, শ্মশানের উপর, ঘাটের নিকট ও মাঠে মাঠে কেন যে বেড়াইতাম বলিতে পারি না—কিন্তু কথায় কথায় অধ্যায়টা যে বড় হইল—একে বৃদ্ধ তাহাতে নূতন লেখক, এ দোষ ধর্ত্তব্যই নয়। যাহা সুন্দর তাহা নিয়ত নিকটে রাখিতে ইচ্ছা যায়, সেই জন্য এই আনন্দময় বাল্যজীবন স্মরণ করিয়া লিখিতে লিখিতে এ অধ্যায় সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বিশেষতঃ পরে জীবনের কণ্টকিত পথে চলিতে চরণে অনেক কণ্টক বিঁধিয়াছে।

স্বপ্নের আনন্দ ও কষ্ট যেমন প্রবল, বাল্যকালের সুখদুঃখও তেমনই। তার পর যত দিন যায়, যত পরমায়ু ক্ষীণ হয়, ততই সুখদুঃখের আশা ক্ষীণ হইয়া আসে।

সে সময়ের আরো কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা পরবর্ত্তী তিন অধ্যায়ে বলিব। তখনকার কথা লিখিতে মনে কি অপূর্ব্বভাব হইতেছে! আমি এমন লোক দেখি নাই, যাহার ছেলেবেলার কথা আলোচনা করিতে ব্যথিত হৃদয় শান্ত না হয়। যদি এই অর্দ্ধস্ফুট বাল্যকাল কি তাহা বুঝিতে পারিতাম, তবে আর

জীবনে কিছুই জানিবার থাকিত না। দূর হইতে দেখিতে বাল্যকাল যেন ছায়ায় ও অন্ধকারে আবৃত—কি যেন তখন জানিতাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি, কি যেন তখন ছিল কোথায় তাহা হারাইয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে পঠিত উপন্যাসের কথার ন্যায়, অথবা অনেক দিন পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের দৃশ্যের মত তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু মাঝে মাঝে তাহার আভাস মনে পড়িয়া হৃদয়ে অস্ফুট আনন্দ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বন্ধুগণ।

"Friendship is the nearest thing we know to what religion is. God is love. And to make religion akin to friendship is simply to give it the highest expression conceivable by man."

Drummond's 'Changed Life.'

সঙ্গীদের মধ্যে আমার একজন সমপ্রাণ বন্ধু ছিল, তাহার নাম কামাখ্যা। কামাখ্যার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না; তাহাদের বুড়ো ঝি মানুর মা তাহাকে মানুষ করিয়াছিল।

আমার দ্বিতীয় বন্ধু 'ভোলাদাদা'—সম্পূর্ণ নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু সে নামে তিনি খ্যাত ছিলেন না। 'ভোলা-দাদা' বলিয়াই সকলে তাঁহাকে ডাকিত। গ্রামশুদ্ধ লোকে

তাঁহাকে লইয়া আমোদ করিত—তিনি স্থূলকায়, দেহখানি প্রায় গণেশের মত পরিপুষ্ট ও ভুঁড়িবিশিষ্ট। তিনি 'আকার-সদৃশপ্রজ্ঞ'—বুদ্ধিও তাঁহার শরীরের মত—কিন্তু সে কথাটা বুঝি বলা ভাল হইল না, তবে সত্যের অনুরোধে না বলিলেও নয়। বিধাতা ভোলাদাদাকে সৃজন করিয়া অনেক গুণ দিয়াছিলেন, আমোদপ্রিয়তা তন্মধ্যে প্রধান,—কিন্তু স্মরণশক্তি দেন নাই, অথবা অতি অল্প পরিমাণেই দিয়াছিলেন। তিনি খণা অর্থাৎ এক একটা কথা নাকে কহিতেন। রাত্রে তাঁহার কথা শুনিলে ছেলে বেলায় শাঁকচূর্ণী বলিয়া ভয় পাইতাম। তিনিও সন্ধ্যার পর কোন বালককে পথে একেলা দেখিলে অন্তরালে থাকিয়া 'ওঁরে কোঁথা যাঁচ্চিস্? আঁমি এঁখানে আঁছি' কিম্বা 'এঁই গাঁছেতে আঁমি বঁসি, ছেঁলেঁ খেঁতে ভাঁল বাঁসি' ইত্যাদি বলিয়া ভয় দেখাইতেন।

ভোলাদাদার দুই ভগ্নী সুষমা ও মহিমা—মহিমা কনিষ্ঠা। কামাখ্যার মত অতি শৈশব কালে তাহাদের পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছিল; খুড়িমার যত্নে তাহারা প্রতিপালিত। ভোলাদাদারও বাড়ী মনুনগরে কিন্তু অন্য পাড়ায়। তাহাদের বাড়ী গঙ্গাতীরের নিকট। ভোলাদাদা তাঁহার ভগ্নী দুটীকে 'লক্ষ্মী সঁরস্বতী' বলিয়া ডাকিতেন। কামাখ্যা কখনও তাহাদের "গঙ্গাযমুনা" কখনও বা "শিশিরবসন্তে"র সহিত তুলনা করিত—কারণ সুষমা কৃষ্ণবর্ণা, মহিমা উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা—সুষমা শান্ত, যেখানে বসিত সেখান হইতে শীঘ্র উঠিত না, চলিবার সময় ধীরে ধীরে অবনত মুখে চলিয়া যাইত; মহিমা চঞ্চল, একজায়গায় স্থির হইয়া থাকিত না, ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। আমার মনে হইত

তাহারা দুটী ভগ্নী সৃষ্টির দুটী অপূর্ব্ব পদার্থের মত, একটী কোহিনুরের মত হৃদয়ানন্দকারী নয়নাভিরাম ও উজ্জ্বল—আর একটী প্রভাতশিশিরসিক্ত কুসুমলতিকার মত শীতল, শান্ত ও অবনতমুখী।

আমরা সকলে মিলিয়া কুশঠানদিদির 'বাঘ ও কড়ি গাছ' 'সাতভাই চম্পা' ইত্যাদি গল্প শুনিতাম, এবং তাঁহার অসীম বুদ্ধির মনে মনে প্রশংসা করিতাম। কুশদিদি বিধবা, বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর। তিনি বড় বুদ্ধিমতী, গ্রামে কোন বিবাহ হইলে বরযাত্র ঠকানে প্রশ্ন আমাদের শিখাইয়া দিতেন। কুশদিদি যে শুধু আমোদ ভক্ত তাহা নহে, ডাক্তার কবিরাজেরা বড় মনুনগরে স্থান পাইতেন না—কুশদিদি যে সমস্ত ঔষধ জানিতেন কোথায় তাঁর কাছে ডাক্তার কবিরাজদের ঔষধ লাগে? আর কাহারও অসুখ হইলে আবশ্যকমত তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতেন। তিনি কাহারও নিকট কিছুর প্রত্যাশী ছিলেন না। সে ধরণের স্ত্রীলোক আজ কাল বড় কমিয়া আসিতেছে—ছেলে বেলায় গ্রামে দুচারটী দেখিতাম,এখন প্রায়ই দেখা যায় না। আর ২০ বৎসর পরে একেবারেই দেখা যাইবে না, এবং লোকে এইরূপ পুস্তকে তাহার বর্ণনা দেখিয়া মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে। সে যাহা হউক ভোলাদাদা ও কুশদিদি না হইলে আমাদের গ্রাম নিরানন্দ হইত।

মনুনগর গ্রামটী অতি ছোট, মোট ৪০।৫০টী গৃহস্থের বসতি মাত্র। তন্মধ্যে আমরা পাঁচঘর কুলীন ব্রাহ্মণ—প্রথম আমাদের, দ্বিতীয় ভোলাদাদার, তৃতীয় কামাখ্যার, চতুর্থ কুশদিদির ও পঞ্চম শিরোমণি মহাশয়ের ঘর।

এতদ্ভিন্ন কয়েক ঘর পূজাজীবী ব্রাহ্মণ, মসীজীবী কায়স্থ, বটীকাজীবী বৈদ্য, শঠতাজীবী নাপিত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আছে। মনুনগর গণ্ডগ্রাম না হইলেও মানব ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত গ্রাম্যসম্প্রদায়ের মত ইহাতে সকল বর্ণের ও সকল ব্যবসায়ের লোকই বাস করে। ইহার সুবিধা এই যে ধোপা নাপিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কামার কুমারের জন্য অপর গ্রামে যাইতে হয় না।

জাতি ও বর্ণভেদ সহজে যায় না। মনুনগরের কুলীন ব্রাহ্মণ পাঁচঘর যেন অন্যান্য গৃহস্থ হইতে স্বতন্ত্র। বহুকাল পূর্ব্বে দুই দল বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীজঙ্গ গ্রাম হইতে এখানে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন এবং অকর্ষিত ভূমি, ফলিত বৃক্ষ ও পবিত্র গঙ্গা দেখিয়া, এই গ্রামেই বাস করেন। তাঁহারাই আমাদের পাঁচ ঘরের পূর্ব্বপুরুষ। সে অনেক দিনের কথা, প্রায় তিন শতাব্দ গত হইল। কিন্তু অদ্যাপি কেহ কেহ লুকাইয়া আমাদের 'বাঙ্গাল বামুন' বলে। লুকাইয়া বলে এইজন্য, যে আমরা গ্রামের জমিদার—সকলেই সময়ে অসময়ে আমাদের নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করে। সেইজন্য অপর চার ঘর কুলীন ব্রাহ্মণদেরও গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি আছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গণক ও চারটী ভবিষ্যদ্বাণী।

"There are more things in Heaven and earth Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

Shakespeare.

ছেলে বেলায় আমাদের গ্রামে একজন গণক আসিয়াছিলেন—সচরাচর যে সমস্ত লোক গণক বলিয়া পরিচয় দিয়া নির্ব্বোধ মনুষ্যদিগকে ঠকাইয়া পয়সা লয় তিনি সেরূপ নহেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলের ভক্তি হইল। ছাই মাখিলে যদি এমন কান্ত মূর্ত্তি হয়, স্বল্প আহারে যদি এমন বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর হয়, তবে কেন লোকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য শরীর মন সকলই বিক্রয় করে? তাঁহাকে দেখিয়া এই কথা সকলেরই মনে হইয়াছিল। তাঁহার ভাব অতি নম্র, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরিধানে গৈরিকবসন, কপালে রক্তচন্দন ও হস্তে একটী ছোট ত্রিশূল। তাঁহার ভাবগতি ও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সকলে বুঝিল ইনি একজন প্রকৃত পণ্ডিত। এইরূপ দুই এক জন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ আছেন বলিয়া এ শাস্ত্রে লোকের আজিও বিশ্বাস আছে, এবং মূর্খ ও শঠ গণকাভিধেয় ব্যক্তিগণ সেই বিশ্বাসের বলে অনেককে প্রতারণা করিতে সমর্থ হয়; বিজ্ঞচিকিৎসকেরা রোগ আরোগ্য করে দেখিয়া ধূর্ত্ত হাতুড়ে বৈদ্যও আপনাকে চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সেই মহাপুরুষ গণক আমাদের বাহিরের রকে বসিয়া একে

একে গ্রামের অনেকের হাত ও কোষ্ঠী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন—দেখা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "আজ আমি এখানে কয়েক জনের হাতে যাহা দেখিলাম, এমন কখনও দেখি নাই।" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করত আমাকে, কামাখ্যা, ভোলাদাদা, সুষমা ও মহিমাকে নিকটে ডাকিলেন। আমরা একে একে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে এক সারিতে দাঁড়াইলাম, যেন সিপাহীরা সেনানীর আদেশে সারি দিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইল। গণক মহাশয় তখন বলিলেন—

"এই পাঁচ জনের ভাগ্যসূত্র এক সঙ্গে মিলিয়াছে। সুখ দুঃখ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বৈরাগ্যাদির কারণ কি তাহা কেহ জানে না। মনে করুন স্বর্গে সুখদুঃখ ইত্যাদি নামে নানা বর্ণের সূতা আছে, —স্বর্গের অপ্সরাগণ সেই সকল সূতা লইয়া প্রত্যেক মনুষ্যের এক একটী ভাগ্যসূত্র গাঁথেন। যাহার ভাগে যে পরিমাণে সুখ-দুঃখের সূতা পড়ে, সে পৃথিবীতে সেইরূপ সুখ দুঃখ লাভ করে। এই ভাগ্যসূত্রগুলি গ্রথিত হইয়া একটী বৃহৎ বৃক্ষের ডালে ঝুলান থাকে। কখন কখন তিনচারিজনের ভাগ্যসূত্র একসঙ্গে জড়াইয়া যায়। আমি দেখিতেছি এই পাঁচ জনের ভাগ্যসূত্র একসঙ্গে মিশিয়াছে—ইহারা পরস্পরের সুখদুঃখে সুখী ও দুঃখী হইবে। আমার কথায় আপনাদের প্রত্যয় না হয় লিখিয়া রাখুন, পরে দেখিবেন তাহা ফলে কি না।"

পিতার কথা মত আমি গণকের কথাগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—(সে কাগজখানি আজিও আমার নিকটে আছে)— গণক মহাশয় আরও বলিলেন—

(১) "ইহাদের মধ্যে একজনের অকস্মাৎ গৃহ শূন্য হইবে।

(২) ইঁহারা সকলেই বিদেশ ভ্রমণ করিবেন।

(৩) একজনের অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু আছে।

(৪) আর একজন অল্পবয়সেই তীর্থবাসী হইবেন। তিনিই আর সকলকে হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বুঝাইবেন”।

গণকের কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল। তাঁহাকে আরও অনেক প্রশ্ন করা গেল, কিন্তু তিনি সে সমস্তের উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আড়ি ও ভাব।

"O! could I feel as I have felt or be what I have been,
Or weep as I could once have wept over many a vanished scene."

Byron.

মহিমা এক হরিণ পুষিয়াছিল, তাহার নাম তরু—নামের গুণে হউক অথবা স্বভাবের গুণে, তরুর ছোট গাছের সহিত বড়ই সদ্ভাব ছিল—অর্থাৎ ছোটগাছ পাইলেই তরু দৌড়াইয়া গিয়া উদরসাৎ করিত। একদিন আমাদের ফুলবাগানে আসিয়া তরু ভাল ভাল অনেক ফুলগাছ খাইয়াছিল—আমি তাহা দেখিতে পাইয়া তরুর পায়ে সজোরে এক ঢিল মারি, তাহাতে তার এক পা খোঁড়া হইয়া যায়। মহিমা তাহা জানিতে পারিয়া আমার সঙ্গে আড়ি করে।

ছেলে বেলার আড়ি বড়লোকের দয়ার মত, কথায় কথায় আসে কথায় কথায় যায়। সেই আড়ির পর ভাব কেমন সুন্দর! মহিমার সহিত সেবার আড়ি অনেক দিন ছিল। আড়ির পরে প্রথমে দুজনেরই রাগান্বিতভাব—দেখা হইলেই নিকট হইতে চলিয়া যাই। কিছু দিন পরেও রাগ—কিন্তু তখন দেখা হইলে শুধু মুখ ফিরাই। তার কিছু দিন পরে মনে রাগ নাই, কিন্তু কথা বার্ত্তা হয় না। আবার কিছু দিন পরে দেখা হইলে উভয়ে একটু হাসিতাম, কিন্তু তখন ও কথা হইত না। কেহই আগে কথা কহিতে চায় না, তাই দুজনে তখনও কথা হয় না।

মহিমার সহিত আড়ির এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এমন সময়ে পিতা আমাকে পড়াইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাই-বেন বলিলেন। মনুনগরের স্কুলে ভাল পড়া হইত না। তখন আমার বয়স ১২ বৎসর।

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বদিন কামাখ্যার নিকট বিদায় লইতে তাহাদের বাগানে যাইলাম—কুঞ্জপুকুর নামে তাহাদের স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকার তীরে যে বড় কামিনী গাছটী আছে তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কত কাঁদিলাম—যেন জন্মের মত বিদায় হইতেছি। ছেলেবেলায় একবার গ্রাম ছাড়িয়া অন্যগ্রামে কিছু দিনের জন্য যাইলে মনে হইত নূতন জীবন আরম্ভ হইতেছে, ভবিষ্যতে যেন একবারে পরি-বর্ত্তন হইয়া যাইব। আমি প্রায় শতবার কামাখ্যাকে বলিলাম 'ভাই! আমাকে ভুল না'—এবং ঐ কামিনী গাছের ডালে এক-খানি কাগজ বাঁধিলাম, তাহা বাতাসে উড়িতে লাগিল—দেখিয়া কামাখ্যাকে বলিলাম, "দেখ কাগজ কেমন বাতাসের সহিত

খেলা করিতেছে, আমরা যেমন খেলা করি সেইরকম ইহারাও পরস্পরকে হাসাইতেছে। এ কাগজ যেন কেহ ছিঁড়ে না, আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিব ইহা থাকে কি না—আর এই কাগজ দেখিলে তোমারও আমাকে মনে পড়িবে।"

সেই সময়ে মহিমা তথায় আসিল; আমি মহিমার সঙ্গে কথা কহিলাম —'মহিমা! আমি কাল কলিকাতায় যাইব, তোমার সঙ্গে আড়ি রাখিয়া যাইলে বড় কষ্ট হইবে, তোমার হরিণ মারিয়া যে দোষ করিয়াছি মাপ কর।'

মহিমা বলিল "আমিই তোমার সঙ্গে আড়ি করিয়া অন্যায় করিয়াছি! বল আমার অপরাধ লইবে না?" এই বলিয়া মহিমা হাত যোড় করিল।

আমি বলিলাম 'তোমার দোষ নয়, আমারই দোষ। তা যাহা হইয়া গিয়াছে যাউক, আর কখনও দুজনে আড়ি করিব না।'

যদি মনুনগরে থাকিতাম তবে এ কথা রহিত না, আবার ২।৩ দিন পরে হয়ত আড়ি হইত। পরদিবস প্রাতে আমি কলিকাতায় যাইলাম। মনুনগর ও ছেলেবেলার বন্ধুগণ ছাড়িতে মনে কষ্ট হইয়াছিল—কিন্তু বেশীক্ষণ নয়—পথে বুঝি একটু কাঁদিয়াছিলাম—ছেলেবেলার কান্নাতেও এখন হাসি পায়। আধ ঘণ্টা পরে হাসিমুখে কলিকাতায় পৌঁছিলাম। সুমধুর বাল্যকাল ফুরাইল।



প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

শিক্ষা ও ধর্ম্মে অবিশ্বাস।

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদয় হইত "এ জীবন লইয়া কি করিব?" "লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব'।

পাঠক মহাশয় বৌমাষ্টারের যাত্রা শুনিয়াছেন কি? সীতার বনবাস অভিনয় হইতেছে, রাবণ সীতাকে লইয়া গিয়াছে; দুঃখে সভাস্থ বৃদ্ধগণের চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছে এবং বালকগণ সেই সুযোগে বৃদ্ধদের চাদরে চাদরে বাঁধিয়া দিতেছে—এদিকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ

কিরূপ ? তীরধনুহস্তে দুইবার সভা প্রদক্ষিণ করিয়া রামলক্ষ্মণ পঞ্চবটী বন হইতে লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। দুইবার প্রদক্ষিণের পর যেখানে পঞ্চবটী বন ছিল সেইখানেই লঙ্কার স্বর্ণপুরী হইল। সেইরূপ আমরা এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিয়া সাত বৎসর অতিক্রম করিলাম। পূর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত ঘটনার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—এখন আর আমরা বালক নহি, স্কুলত্যাগ করিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছি।

কিন্তু কলিকাতায় আসিলাম না অরণ্যে আসিলাম? কলিকাতায় আসিবার পর সাত বৎসর চলিয়া গেল তবু ত কাহারও সহিত বন্ধুত্ব হইল না। যাহাদের সহিত মুখের আলাপ হইল তাহাদের দেখিলে একটু হাসি কিম্বা কখনও একটু স্নেহপ্রকাশ করি; সেরূপ ভাবত অরণ্যের পশুর প্রতিও হয়। কলিকাতায় কত লোকের সহিত কত তর্ক ও যুক্তি হইল, কিন্তু তাহাদের মনের সহিত মন ত মিলিল না, তাহাদের ছেলেবেলার কিম্বা অন্তরের কথা কিছুই যে জানিলাম না!

এই সাত বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রামে দুইটী বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম ভোলাদাদার বিবাহ—মন্নুনগরের কাছে হরিপুর গ্রামে—তার পর হইল সুষমার ও কামাখ্যার বিবাহ।

ঐ দুইটী বিবাহ ভিন্ন এ সময়ের আর কোন বিশেষ ঘটনাই মনে হয় না। সমস্ত দিনই লেখাপড়া করিতাম—আমরা যেন বিদ্যোপার্জ্জনের কল, সারাদিন ঘেনর ঘেনর করিয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া নানারকম বিদ্যা উদরস্থ করিতেছি। কলের যেমন হৃদয় নাই, ধর্ম্ম নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, আছে কেবল বিজাতীয় শব্দ ও দ্রুতগতি—আমাদেরও তখন আর

কিছুই ছিল না—ছিল কেবল উচ্চৈঃস্বরে পড়া মুখস্থ করা ও তাড়াতাড়ি কতকগুলি পুস্তকের কথা পেটে পূরা।

এই ধর্ম্মহীন শিক্ষা বিষম অনর্থের মূল। শিক্ষার সময় তাহা বুঝা যায় না—সে সময় উদারচেতা মহাত্মাদের জীবনচরিত পড়িয়া মনে হয় আমিও জীবনে মহৎ কার্য্য করিব। কিন্তু যে গৃহের ভিত্তি ভাল নহে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আমাদের মধ্যে কয়জন আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারে? ধর্ম্মহীন জীবনই এ অনর্থের মূল।

কামাখ্যাও কলিকাতায় পড়িত—কিন্তু তাহার বাসস্থান দূরে থাকায় কলিকাতায় তাহার সহিত দেখা হইত না। মনুনগরে আসিয়া কামাখ্যার সহিত দেখা হইলে দুজনে যে কথা কহিতাম তাহা আমার অমৃতের ন্যায় মধুর বোধ হইত।

নীলাকাশরঞ্জিতসুন্দরতরুরাজিপূর্ণ মনুনগরের সেই সুবিস্তৃত গঙ্গাতীরে বসিয়া দুজনের কথা হইত। দিনান্তে সেখানে আসিয়া বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা যাইত না। ধীরে ধীরে কৃষ্ণবসনা সন্ধ্যাদেবী আসিয়া পৃথিবীর সহিত দুটো সুখদুঃখের কথা কহিয়া চলিয়া যাইত, তাহার স্থানে স্পৃহনীয়াকান্তি তারকাশোভিতা রজনী আসিয়া বসিত। নববিবাহিতা বধূর ন্যায় রজনীরমুখে কথা নাই, মাঝে মাঝে কেবল নৈশবায়ুর মৃদু মৃদু হাসি। সে হাসি দেখিয়া পৃথিবী হাসিত না; কেবল যেদিন রজনী আসিবার সময় চারুভূষণা চন্দ্রমাকে সঙ্গে করিয়া আনিত সে দিন পৃথিবীর মুখে আর হাসি ধরিত না। সন্ধ্যা যাইয়া রজনী আসিবার অনেকক্ষণ পরও কামাখ্যা ও আমি সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতাম।

সেইখানে বসিয়া কামাখ্যা গান গাইত—আমি শুনিয়া আত্মহারা হইতাম—কামাখ্যার স্বর কি মধুর! এই গানটী আমার বড় ভাল লাগিত—

১

কবে যেন দেখেছি তোমারে
কেন মনে আজ পড়ে না ?
ছায়া আছে মনের ভিতরে
ছবি কেন আঁকিতে পারি না ?

২

কেন ভুলাইতে মানবেরে
কথা শিখাইলে তারে ?
ভাব আছে হৃদয় মাঝারে
ভাব সম কথা আসে না।

৩

তুমি যেন ডাকিছ আমায়
কোথা হ'তে তাহা জানি না ;
চারি দিকে খুঁজিহে তোমায়
তব দেখা কেন মিলে না ?

একদিন সেই গঙ্গাতীরে বসিয়া কামাখ্যা বলিল—

'অমৃত! তুমি কি কখন ভাবিয়াছ এই পৃথিবীতে আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? কেন আসিলাম? ও কোথায় যাইব ?'

আমি। সকল মনুষ্যই বোধ হয় একথা ভাবে এবং আপন আপন বুদ্ধিমত একথা বুঝিতে চেষ্টা করে।

কামাখ্যা। ‘দেখ, ওই তাল গাছটী যেমন আকাশ স্পর্শ করিতে পারে না, নিয়মের বশীভূত হইয়া কতকদূর উঠিয়া আর উঠিতে পারে না, তেমনই মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমা আছে। শুন নাই সেকালে যখন মুনিঋষিরা কঠোর তপস্যা করিয়া পরমার্থ লাভের উপযুক্ত হইতেন, ইন্দ্র কি উপায়ে তাহাদের তপস্যা নিষ্ফল করিতেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে মনুষ্যে এই সকল তত্ত্ব বুঝে।’

আমি। তবে কি তুমি বল সেকালের ধর্ম্মপণ্ডিতগণ এ তত্ত্বের নির্ণয় করিতে পারেন নাই?

কামাখ্যা। ‘না—তাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছেন মাত্র। যেমন কোন কোন স্বপ্নে মনে হয় “এ স্বপ্ন নয়, ঠিক দেখিতেছি”—তাঁহাদের বিজ্ঞানও তদ্রূপ।’

আমি। তবে কি সকল ধর্ম্মই ভুল?

কামাখ্যা। ‘চতুর লোকে সমাজকে ভুলাইবার জন্য ধর্ম্মের সৃজন করিয়াছে। সকল ধর্ম্মের কথাই ভুল—বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্মের—হিন্দুধর্ম্মে কত অসম্ভব কথা! যে সুশিক্ষা পাইয়াছে সে কখনই হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে পারে না। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এরূপ যত কথা আছে সকলই আকাশ-কুসুমের ন্যায়।’

আমিও তেমনই বুঝিলাম। যেমন মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া যায়, তেমনই কামাখ্যার যুক্তি আমার নাসিকায় রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গেল। বুঝিলাম এতদিন পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা জানিয়াছিলেন তাহা সকলই ভ্রান্তি।

পাঠক মহাশয় বোধ হয় এতক্ষণে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন,

এবং বলিতেছেন "এ কি জীবনচরিত না ন্যায়শাস্ত্র? বুড়ো ধান্ ভানিতে শিবের গীত আনিল রে!"—কিন্তু আমি ন্যায়শাস্ত্রও লিখিতেছি না, উপন্যাসও লিখিতেছি না, আমার জীবনে ও মনে যাহা ঘটিয়াছে তাহাই লিখিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহিমার কবিতা—আমার আনন্দ।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল।"
বিদ্যাপতি।

মন্নুনগরে আসিলে মহিমাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিতাম। তাহার কি স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি! পড়াব কি? আমি পড়াইতে গিয়া তার লেখা পড়িতাম—অতি সহজে সুললিত কবিতা রচনা করিত। তখন সে কবিতা পড়িয়া যে আনন্দ হইত স্বয়ং কালিদাস আসিয়া কবিতা শুনাইলে তেমন হইত কি না সন্দেহ। একদিন মহিমা তাহার মধুর কণ্ঠে পরপৃষ্ঠলিখিত কবিতাটী পড়িয়া আমাকে শুনাইল :—

নলিনী ও হেম।

(১)

"দিনমনি ডুবে যায়, মধুর বহিছে বায়,
চল হেম! যমুনার তীরে দুজনে,
হাসি হাসি খেলিব যমুনা সনে।

(২)

শীতল যমুনা জল, শীতল পাদপতল,
শীতল হইবে মন তথা গমনে
জীবনের জ্বালা যত রবে না মনে।

(৩)

বনেতে ফুটেছে ফুল, সুবাসে বন আকুল,
তুলিয়া বনের ফুল পরাবে আমায়,
আমিও গাঁথিয়া মালা পরাব তোমায়।

(৪)

আকাশে ফুটিবে ফুল, সুন্দর তারকা কুল,
কিন্তু এক ফুল কাছে সব ফুল হারে,
ভালবাসা হৃদয়ের ফুল যা দিয়াছি তোমারে।'
এই বলি বালিকা হেমের হাত ধরিল,
যাইতে যমুনা তটে দুজনেতে ছুটিল।

(৫)

'অন্য দিন হেথা এসে, আনন্দে হৃদয় ভাসে,
কেন বল নলিনী হৃদয় আমার
কাঁপিছে আসিয়া আজ তীরে যমুনার ?'—
আসিয়া যমুনাতটে বালক বলিল,
কিন্তু দোঁহে ক্ষণপরে সে ভাব ভুলিল।

(৬)

ভ্রমি সুখে বনে বনে, প্রেমপূর্ণ ফুল্লমনে
নানাজাতি বনফুল করিয়া চয়ন,
পরস্পর কণ্ঠে মালা পরাল তখন।

(৭)

সুন্দর যমুনা জলে, লালপদ্ম ভেসে চলে,
বালিকা সে ফুলদলে নয়নে হেরে,
কহিল বালকে অতি মধুর স্বরে—

(৮)

"তরঙ্গের সঙ্গে চলি, নাচি নাচি হেলি দুলি,
সুন্দর কমল দেখ জলে ভেসে যায়,
মেহারি বরণ তার নয়ন জুড়ায়।

(৯)

সাজাব আমার বেণী, পরিয়া কমলমণি,
সাঁতারি এখনি এনে দাও ওটী,
ত্বরা করি যাও হেম! পায়ে পড়ি দুটী।"

(১০)

বেগে যমুনাজল, ছুটিতেছে কল্ কল্,
ছুটিছে সে কমল সলিলের সনে,
ধরিতে যাইল হেম দ্রুত সন্তরণে।

(১১)

"যেওনা দূরেতে তুমি, চাহিনা ও ফুল আমি,
ফিরে এস দুজনেতে চল যাই ঘরে—"
কহিল নলিনী—হেম তবুও সাঁতারে।

(১২)

'সাঁতারি পারি না আর, ডুবি বুঝি এইবার,
ফিরে যাও নলিনী একাকিনী ঘরে,
আবার মিলিব মোরা মরণের পরে'।

বালকের মুখে আর কথা না সরিল,
আহা! অবশ তাহার দেহ যমুনাতে ডুবিল।

(১৩)

"কোথা হেম! কোথা গেলে, আমারে একেলা ফেলে,
যমুনার জলে তুমি লুকাইলে কেন?
কে মনে মিলিব বল তোমাসনে পুনঃ?

(১৪)

চাহিনা বনের ফুল, চাহিনা তারকাকুল,
চাহিনা পার্থিব সুখ, ছাড়িয়ে সকলে
আমিও যাইব ওই যমুনার জলে।

(১৫)

যেখানে গিয়াছ তুমি, সেইখানে যাব আমি,
জীবন মরণ কি, না বুঝিতে পারি,
তোমা বিনা কোন সুখ নাহি আমারি।"—
এই বলি বালিকাও যমুনাতে পড়িল,
তাহারও সে ক্ষুদ্র দেহ যমুনাতে ডুবিল।

(১৬)

দুটী দেহ ভেসে যায়, ভাবিয়া মহিমা গায়,
"জীবন মরণ কি, না বুঝিতে পারি,
প্রেম বিনা কোন সুখ নাহিক কাহারি"।

মহিমার লিখিত এই কবিতা শুনিয়া আমার মনে হইল ভাল মাটীতে বীজ পড়ার এই গুণ। মহিমা অল্পদিন একটু বাঙ্গালা পড়িয়া কোথা হইতে আনিয়া কেমন লিখিয়াছিল দেখ! আর আমি এই বত্রিশ বৎসর ইংরাজী বাঙ্গালা কত প'ড়ে ও নিজের জীবনের প্রকৃত কথাগুলি গুছাইয়া লিখিতে পারিতেছি না!

সে সময়ের এই দুইটী কথা—ধর্ম্মে অবিশ্বাস এবং কবিতা-প্রিয়তা—মনে রাখা আবশ্যক। আমার জীবনে এইখানে পথনির্ব্বাচন—যদি তখন হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাসের পথে না যাইতাম তাহা হইলে এখন হিন্দুধর্ম্মের মহিমাসন্দর্শনে অত পুলকিত হইতাম না—আবার এই নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক প্রেমের অঙ্কুর হৃদয়ে রোপিত না হইলে সমাজকে ভালবাসিতে শিখিতাম না, সুতরাং ইহজীবনে আমার সে মহিমাসন্দর্শনলাভ ঘটিত না।

তৃতীয় অধ্যায়।



ভোলাদাদার ব্যবসা।

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥"

রামপ্রসাদ সেন

ইতিমধ্যে ভোলাদাদা একবার কাপড়ের ব্যবসা করিয়াছিলেন। তিনি একদিন প্রাতে উঠিয়াই মহিমাকে জিজ্ঞাস করিলেন,

'মহি! তুঁই বড় অঙ্ক জানিস্—বঁল্ দেঁখি একখানাঁ কাঁপড় দুঁই আনা লাঁভ হ'লে দুঁহাজার কাঁপড়ে কঁত লাভ হঁয়?'

মহিমা বলিল "২৫০৲ টাকা।"

ভোলাদাদা তাঁহার নোটবুকে লিখিয়া লইলেন (অধিকাংশ কথাই তিনি ভুলিয়া যাইবার ভয়ে নোটবুকে লিখিয়া রাখিতেন) লেখা শেষ হইলে ভোলাদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন "আঁচ্ছা ২৫০৲ টাঁকা থেকে ২০৲ টাঁকা গোমস্তার মাহিনা বাদ দিঁলে কঁত থাঁকে?"

মহিমা বলিল "২৩০৲ টাকা। এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

ভোলাদাদা। 'দেঁখ্‌বি—তোঁরা মনে কঁরিস্‌ আমি কোন কম্মের নয়—দেঁখ্‌বি এই মাস থেঁকে ঘরে তুঁইশ ত্রিশ টাকা, প্রঁতিমাসে আনিবই আনিব।

মহিমা বলিল "সে কি? এত টাকা কোথা থেকে আসিবে?"

কিন্তু ভোলাদাদা আর উত্তর না দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেলেন।

পরে জানা গেল ভোলাদাদা মন্নুনগরের বাজারে একখানি কাপড়ের দোকান খুলিতেছেন এবং কুড়ি টাকা মাহিনা দিয়া একটী গোমস্তা রাখিবেন।

সকলেই ভোলাদাদাকে একার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল—কিন্তু ভোলাদাদা শুনিলেন না।

গোমস্তা রাখিয়া দোকান খোলা হইল—প্রথম প্রথম গোমস্তার গুণে কিছু লাভ হইতে লাগিল—ভোলাদাদা সকলকে বলিলেন 'দেঁখ্‌লে আমার কেমন বুঁদ্ধি!'

একদিন গোমস্তার পীড়া হইয়াছিল—ভোলাদাদা স্বয়ং দোকানে বসিলেন। গ্রামের কোন ভদ্রলোক সেই দিন ভোলাদাদাকে ঠকাইয়া চারি শত টাকার কাপড় একশত টাকায় কিনিলেন—এবং মূল্যস্বরূপ দুই খানি ৫০৲ টাকার নোট দিলেন। ভোলাদাদা পথে আসিতে আসিতে অন্যমনস্কে সেই নোট মুড়িয়া কান খুঁটিতে লাগিলেন, এবং কান খুঁটা শেষ হইলে পথের ধারে পুকুরের জলে তাহা ফেলিয়া দিয়া বাড়ী আসিলেন।

এই লোকসানে দোকান বন্ধ হইল। তখন ভোলাদাদা গ্রামে যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া বলিতেন,

"তোমরা বঁলেছিলে তাঁই দোঁকান কঁরেছিলাম, এঁখন লোঁকসান হঁইল কেবল তোমাদের কঁথা শুনে!"—মহিমার উপর ভোলা-দাদার বিশেষ কোপ হইল—তিনি বলিতেন, "ওঁইত আমাকে হিঁসাব করে বুঁঝিয়ে দেছিল ছুঁইশ ত্রিশ টাকা মাসে লাঁভ হ'বে—হিঁসাবের কথা মিথ্যা হঁয় না।"

যাহা হউক—এ বিরক্তি অন্তভাবের ন্যায় ভোলাদাদার মনে অধিক দিন রহিল না। কেবল এই লোকসানের পর তিনি সিদ্ধির মাত্রাটা দ্বিগুণ বাড়াইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হেমলতা।

'হাসি পাশে কান্না বসে
এই পৃথিবীর গতি'—

অকিঞ্চন দাস।

ভোলাদাদার বিবাহের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভোলা-দাদার স্ত্রীর নাম হেমলতা। হেমলতার পিতা হৃষীকেশ বিদ্যারত্ন মধ্যবিত্ত লোক—কিছু জমি জারাৎ আছে। তাঁহার একমাত্র কন্যা হেমলতাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

হেমলতা যখন বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িত তখন লেখাপড়ায় পশম বুনায় বিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্তমবালিকা ছিল। সে চির-কালই বড় ধীর—এই শান্ত স্বভাবের জন্য বাড়ীতে ও গ্রামে সকলেই হেমলতাকে প্রশংসা করিত।

হেমলতার বয়স এখন ১৫। ১৬ বৎসর—দেখিতে সুশ্রী—রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, যাহা অনেকের মতে 'ধপধপে ফরসা'র চেয়ে ভাল, এবং যে বর্ণ অনেক বঙ্গীয় রমণীর অপূর্ব্ব রূপের প্রধান কারণ। হেমলতা বড় বুদ্ধিমতী—তার চক্ষু যার দিকে ফিরে মনে হয় যেন তার অন্তর অবধি দেখিতে পায়, কিন্তু হেমলতার মুখপানে চাহিয়া তাহার অন্তরের ভাব কেহ দেখিতে পাইত না।

তার মুখ খানি নিয়ত এত মলিন কেন? হেমলতা বাপের বাড়ীর এত আদরের মেয়ে—শ্বশুরালয়েও সকলে তাহাকে এত যত্ন করে—কিন্তু সে রাহুগ্রস্তশশীসম মুখে আনন্দ নাই।

হেমলতা বাড়ীর বৌ—তার মুখে হাসি নাই বলিয়া কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিত না,—কারণ আমাদের মধ্যে বধূ অপেক্ষা কন্যাদের হাসিবার অধিকার বেশী।

গৃহকর্ম্মে হেমলতার মন নাই—সংসারের জিনিস পত্র কোথায় যায় কোথায় থাকে সে চিন্তাই নাই। সংসারের নিত্যকর্ম্ম তাহার কাছে যেন তুচ্ছ।

ভোলাদাদা যত্ন অযত্ন জানিতেন না। হেমলতার সহিত কখন কথা কহিতেন, আবার খেয়াল হইলে কথাও কহিতেন না। যে কারণেই হউক স্বামীস্ত্রীতে প্রথমে ছোটরকম ক্রমে ক্রমে গুরুতর মনের অপ্রণয় হইল। ইহা বলা বাহুল্য যে ভোলাদাদা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। হেমলতা ভোলা-দাদাকে তুচ্ছ করিয়া কোন কথা বলিলে ভোলাদাদা বলিতেন 'তুমি আঁমাকে অমন কঁর কেন গা?' বলিয়া বাহিরে যাইতেন —বাহিরে যাইয়া পড়িতে বসিতেন, কিম্বা সিদ্ধি ঘুঁটিতেন।

একদিন মহিমা হেমলতাকে বলিয়াছিল—'বৌ তুমি দাদার

সঙ্গে রেগে কথা কও কেন ?' হেমলতা উত্তর দিল "তুমি আবার কাটাঘায়ে নুনের ছিটা দিতে এলে কেন ? আমার যা দুঃখ তা আমিই জানি—অমন স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল।"

মহিমা। 'ছি ! অমন কথা মুখে এন না'।

হেমলতা। "আমাকে কেহই দেখিতে পারে না—আমি মরিলে সকলেরই আপদ যায়—আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

পঞ্চম অধ্যায়।

বন্ধুহারা।

ফলে সে মিষ্টতা নাই
সে বাস না ফুলে পাই
শীতল সে সরঃস্নানে তেমন না হয়।
নাই সে শরীর মন
তবু আমি সেই জন
ফুটিতেছে ক্রমে হৃদে স্মৃতি সমুদয়,
ফল ফুল নাই বন আছে কাঁটাময়।

৺ সু—মজুমদার।

এই সময়ে কামাখ্যার মনোভাব কি এক রকম হইল তাহা আমি কোন রকমেই বুঝিতে পারিলাম না। দেখা তাহার সহিত প্রায়ই হয় না—যদি অনেক চেষ্টা করিয়া একদিন তার দেখা পাই তবে তার মনটা কিছুই দেখিতে পাই না। সকল কথাই সে আমার কাছে গোপন করে।

বড় সাধ হইত আবার ছেলেবেলার মত কামাখ্যার সহিত মনের ভাব হয়—সেই জন্য প্রায়ই কামাখ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। আমি তখনও কলেজে পড়ি—কামাখ্যা তখন কলেজ ছাড়িয়া নিজের লাখেরাজ জমি সুবিধামত বিলি করিয়া সংসার চালাইতেছে। মনুনগরে আসিলেই আমি কামাখ্যার বাড়ীতে যাইতাম—কিন্তু সে যেন চেষ্টা করিয়া আমার সহিত দেখা করিত না।

একদিন তাহার সাক্ষাৎ পাইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

'কামাখ্যা! তুমি আমাকে ভালবাস না কেন? তোমার সহিত বেড়াইবার জন্য আমি লালায়িত, কিন্তু তুমি আমাকে দেখা দাও না। যেমন ছেলেবেলায় একমন একপ্রাণ ছিলাম এখনও কেন না তেমনই থাকি?'

কামাখ্যা বলিল, "ছেলেবেলার সহিত এখনকার তুলনা করিও না—আমি এখন সংসারী হইয়াছি। ছেলেবেলায় মনে নিরাশার আবরণ ছিল না। তখন অনন্ত আশাপূর্ণ-হৃদয় সর্ব্বদাই নাচিত, এখন মনে আশার সহিত নিরাশা গাঁথা। তখন প্রকৃত বন্ধুতা ছিল—বন্ধুকে আপনার মত ভাল বাসিতাম, এখন সেরূপ ভালবাসা স্বপ্নের দৃশ্য। তখন হৃদয় ভাবশূন্য আনন্দময় ছিল, এখন যেন একখানা প্রস্তর নিয়তই বুকে বাঁধা। তখন পবিত্রতার গুণে আপনাকে ভাল বাসিতাম, এখন পদে পদে ভ্রম দেখিয়া নিজের উপরও অভক্তি হইয়াছে। তখন জলে স্থলে সর্ব্বত্র কি এক ভাব ছিল—এখন সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলেও তাহা পাইব না; মনচক্ষে ছানি পড়িয়াছে—সকলই আর এক রকম দেখি। আশা, ভালবাসা, আনন্দ ও

পবিত্রতা সকলই তখন ছিল—এখন নিরাশা, আত্মসুখেচ্ছা, নিরানন্দ ও আত্মগ্লানি হৃদয়কে বেষ্টন করিয়াছে। ছেলেবেলার সহিত এখনকার তুলনা করিও না।”

আমি বলিলাম ‘আর সব বিষয়ে তুলনা না হউক ভালবাসিতে মনুষ্য বড় হইলে অধিক শিখিতে পারে।’

কামাখ্যা একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল “তোমার এখনও অনেক বুঝিতে বাঁকি আছে। আর এরূপ কথা বার্ত্তায় কোন লাভ নাই।”

তথাপি আমার মনে কামাখ্যার প্রতি পূর্ব্বকারমত বন্ধুভাব রহিল—আর কিছুদিন পরে তাহার মন পরিবর্ত্তন হইবে এই আশা বুকে বাঁধিয়া রাখিলাম। এই রূপে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

অনেক দিন পরে জানিলাম এ জীবনে কামাখ্যার সহিত পুনর্ম্মিলনের আশা বৃথা—দুটী তারা যেমন আকাশ হইতে খসিয়া ক্রমে ক্রমে সহস্রযোজন দূরে আসিয়া পড়ে তেমনি ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া বাল্যবন্ধু কামাখ্যা ও আমি ভবিষ্যজ্জীবনে কে কোথায় যাইয়া পড়িলাম!

‘দিন যায় ত ক্ষণ যায় না’—আমার জীবনে দেখিতেছি তাহাই ঠিক হইয়াছে। গত ৩০ বৎসরের ডায়েরী উল্টাইয়া দেখি বৎসরের মধ্যে অধিক দিবসে অতি অল্প কথাই লেখা আছে—কিন্তু মাঝে মাঝে এক এক দিনের কথা ১০।১২ পাতে ধরে নাই। এই জীবনচরিতে কোন কোন স্থলে এক অধ্যায়ের শেষ ও অপর অধ্যায়ের আরম্ভের মধ্যে অনেক সময়ের ব্যবধান আছে, কোথায় বা এক দিনের কথায় তিন চারি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্যামসুন্দরের ঘাটে চারিজন।

"বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা!
জলো দুধে পুষ্ট দেহ তেলেজলে নেয়ে
হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে"

হেমচন্দ্র।

ঠং ঠঠং ঠং—ঠং ঠঠং ঠং—শ্যামসুন্দর মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। গঙ্গার ঘাট হইতে প্রায় দুই শত হাত দূরে এই মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তর প্রদীপালোকে আলোকিত, কিন্তু বাহিরে কৃষ্ণঘনাবৃত দুর্ভেদ্য অন্ধকার—আজ অমাবস্যার রাত্রি। বৈশাখমাস—বৈশাখের মেঘকে বিশ্বাস নাই—কোন দিন মহা আড়ম্বর করিয়া মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলে—কৃষকের মনে আনন্দ হয় বুঝি আজ বৃষ্টি হইবে, কিন্তু সে মেঘের খেলা মাত্র, একবিন্দুও বৃষ্টি পড়ে না—দুই একটা বিদ্যুতের রেখা দেখাইয়া ক্রীড়াময়ী মেঘমালা আবার কোথায় সরিয়া যায়।

সন্ধ্যাগগনে কোথা হইতে পর্ব্বতকায় ও গজাকৃতি ঘন ঘন কাল মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—সরল বক্রগতি ও শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট নানারূপ বিদ্যুৎ দেখাইয়া অম্বুদবৃন্দ পৃথিবীকে ভয় দেখাইতেছে—অশনির হুহুঙ্কার গর্জ্জনে বসুন্ধরা যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। ভয়ে অনির্ম্মল গঙ্গাজল

দ্রুতবেগে সাগরসমীপে ছুটিতেছে। সমুৎসুক পাখীগণ সৈকতের অন্ধকারাবৃত বৃক্ষসমূহে আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছে—ভয়ে তারকাগণ মুখ লুকাইয়াছে।

কিন্তু পল্লীগ্রামের রমণীদের বুকে যেন ভয় নাই—এই ভীষণ আঁধারে কে কোথায় গঙ্গার ঘাটে কাপড় কাচে? ঐ দেখ তিনটী রমণী শ্যামসুন্দর ঘাটে আগ্রীবনিমজ্জিতা হইয়া আনন্দিত-মনে গা ধুইতেছে—ভয়ানক বজ্রনাদের পর এক বিদ্যুৎ হইল—সেই বিদ্যুতালোকে দেখ রমণী তিনটী কে?—হেমলতা, সুষমা ও মহিমা।

মহিমা। 'দিদি! আজ মেঘটা কিছু বেশী বোধ হ'চ্চে না? শ্যামসুন্দর মন্দিরে কেমন আরতি হ'চ্চে, চল না ভিজা কাপড়েই আরতি দেখিগে—'

সুষমা। না রে—না চল বাড়ী যাই—

মহিমা। 'বুঝেচি—ভয় হয়েচে—তা ভয় কি? আমি তাঁকে ব'লব যে আমার সঙ্গে ছিল—'

সুষমা তখন জল ছিটাইয়া মহিমার গায়ে দিল—রাগে না লজ্জায়?

হেমলতা বলিল, "তোরা বোনে বোনে ঝগড়া কচ্চিস্ আমার গায়ে জল দিস্ কেন লা? দাঁড়া ত আমিও দিই—

তার পর তিনজনে পরস্পরের গায়ে আশানুরূপ জল ছিটাইয়া দিল—আবার সুষমা বলিল,

বড় ঝড় উঠ্‌বে, চল শীঘ্র বাড়ী যাই—

মহিমা। 'ওই জন্যেই হাতে সুতা বাঁধি নি—একটুও নিশ্চিন্ত নাই'?

হেমলতা। "কেন? হাতে সুতা বাঁধলেই কি জাত যায়? এই দেখ্ আমার ভয় নেই, আমি আজ সমস্ত রাত্রি গঙ্গা-তীরে থাক্‌বো"।

মহিমা। তা পার্‌বো না বাপ্‌রে! ঐ বকুল গাছে কি নড়চে, দিদি তোকে ভূতে ধ'র্‌বে।

ভূতের নাম শুনিয়া সুষমা 'রাম রাম' বলিতে লাগিল মহিমা তামাসা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বল

—ভূত আমার পূত?
শাঁকচূর্ণী আমার ঝি;
রামলক্ষ্মণ বুকে আছে
ভূতে কর'বে কি?

না ব'ললে নিশ্চয় ভুতে ধরিবে।

ভীতা সুষমা (আহা! সে মহিমা ও হেমলতার মত অত লেখা-পড়া শিখে নাই—সরলস্বভাবে এখনও ভূত বিশ্বাস ক'রে) তিনবার এই মন্ত্র পড়িল।—এই অন্ধকারে এমন সময়ে এই রঙ্গ!—তাই ত বলি পল্লীগ্রামের রমণীদের বুকে যেন ভয় নাই; সহরের পুরুষগণ এই অন্ধকারে ইহাদের অঞ্চল ধরিয়াও গঙ্গার ঘাটে এখন আসিতে পারেন কি না সন্দেহ।

মহিমা বলিল 'দিদি বল শ্যামসুন্দরের আরতি দেখিতে যাইবে? নহিলে আবার ভয় দেখাইব—ঐ দেখ বকুলগাছের ডাল নড়চে'!

সুষমা। তোর্ রঙ্গ রাখ, আইবুড়ো মেয়েকেই ভূতে ধরে, জানিস্?

মহিমা। 'তুমি আমাকে আইবুড়ো ব'লে রোজ খোঁটা দাও কেন? আমার বিবাহ হবে একটা তারার সঙ্গে—'—

সুষমা। কারা? অমৃতবাবুরা?

এইবার মহিমার লজ্জিতা হইবার পালা পড়িল। সে লজ্জায় দিদির ঘড়া কাড়িয়া দূরে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল—তিনজনে সাঁতার দিয়া ঘড়া ধরিয়া আনিল। আবার মহিমা বলিল—

'দিদি! আমি মরিলে তুমি বাঁচ না? আমি তোমাকে বড় জ্বালাতন করি।'

সুষমা। সে কি? অমন কথা মুখে আনিস্ নি?

মহিমা। 'তবে একদিন লিখে ব'লব'—

সুষমা। তোর রঙ্গ রাখ্—সেই ছেলেবেলায় যখন থেকে বাপ মা ম'রে গেছে দুটী বোনে খুড়িমার যত্নে মানুষ হ'য়েছি—তুই আমার অর্দ্ধেক প্রাণ—আর একদিন তুই মরবার কথা বলেছিলি—সেদিন আমার আর কিছু ভাল লাগে নাই—লুকাইয়া কেবল কেঁদেচি, দুরাত্রি ঘুম হয়নি—বের কথা হলেই তুই মরবার কথা বলিস্। ওকথা আর মুখে আন্‌বি?

আনন্দ কোথায় গেল? অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সুষমা কাঁদিতে লাগিল—বিদ্যুতালোকে মহিমা দেখিল দিদির চক্ষে অশ্রুবারি—দেখিয়া তখনই সুষমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখচুম্বন করিল এবং তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বলিল,

'দিদি! তোমার পায়ে পড়ি কেঁদনা, আর বল্‌বো না, আমার ঘাট হ'য়েছে।'

পাঠক মহাশয়! ভূতভয়ভীতা ছিঁচ্‌কাদুনে সুষমার মত

আর এক নিভৃত কোণে "হেমলতা আমাকে কি জ্বালাতন করে! অপরাধ করিবে—বুঝাইলে বুঝিবে না—শেষে হয় রাগিয়া নয় কাঁদিয়া জিতিবে। একটী কথা বলিবার যো নাই—তাহা হইলে আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া আমার আহার নিদ্রা বন্ধ করিবে—কি বিষম সঙ্কট।"

লেখা হইলে, ভোলাদাদা আবার কাব্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন—এবং ইতিমধ্যে যে ঘটনা হইল তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু সকলে সকল কথা ভুলে না—হেমলতাও তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিল না। এই পৃথিবীতে ইহা নিত্যঘটনা—একজনের হৃদয়ে প্রলয়ের ঝড় বহিয়া হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে—তাহার পার্শ্বে আর একজন কিছু না জানিয়া ভোলানাথ হইয়া বসিয়া আছে।

অষ্টম অধ্যায়।

হেমলতার গৃহত্যাগ।

'O Papa! Papa! She is gone from us—she is gone from us, my sister Livy is gone from us for ever.'

—*Goldsmith's Vicar of Wakefield.*

পরদিবস গ্রামে এক হুলস্থূল পড়িয়া গেল—সুস্থির মন্নুনগর গ্রাম একেবারে তোলপাড় হইয়া উঠিল।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মহিমা দেখিল ভোলাদাদার ঘরের

দ্বার খোলা। ভোলাদাদা সে দিন বাহিরের ঘরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—ঘুমাইলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গান দায়—কাণের কাছে যদি বজ্রনাদ হয় তবু ভোলাদাদার ঘুম ভাঙ্গে না। যাহার কোন দুঃখ নাই, একবার দুঃখ হইলেও একটু পরে তাহা মনে থাকে না, তাহার আবার ঘুমের ব্যাঘাত কি? আমরা সকলে দুঃখ ভুলিবার সময় ভোলাদাদার মত হইলে মন্দ হইত না, কারণ দুঃখ অপেক্ষা দুঃখের স্মৃতি অধিক যন্ত্রণাদায়ী। এক এক রাত্রি ভোলাদাদা বাহিরের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িতেন ও সেই খানেই সারারাত্রি কাটাইতেন। মহিমা তাহার দাদার ঘরের দ্বার খোলা দেখিয়া ভাবিল 'দাদা ত বাহিরে শুইয়াছেন, বৌ ত এত ভোরে উঠে না, তবে এ ঘরের দরজা খোলা কেন?'

তাড়াতাড়ি সে ঘরে মহিমা খুঁজিল কিন্তু সে ঘরে হেমলতা নাই। মহিমার মনটা খট্ করিয়া উঠিল—বৌ কি বাহিরে গিয়াছে? বাহিরে, পুকুরধারে, চারিদিকে মহিমা খুঁজিল কিন্তু হেমলতা কোথায়ও নাই। মহিমা তার খুড়িমাকে ডাকিয়া বলিল 'খুড়িমা! বৌকে কোথায় ও খুঁজিয়া পাইতেছি না, তার দ্বার খোলা, এত ভোরে সে ত উঠে না।' খুড়িমা বলিলেন "যাবে আর কোন চুলোয়? আমার ঘুম ভাঙ্গাস্ নি" বলিয়া তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

মহিমা আবার তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে খুঁজিল এবং খুড়িমার কাছে গিয়া বলিল' 'খুড়িমা! শীঘ্র উঠ সর্ব্বনাশ হয়েছে। বৌকে কোথায়ও দেখিতে পাইতেছি না। আর তাহার গহনার বাক্সটাও কোথায় গিয়াছে—কাপড়ের তোরঙ্গে কাপড় চোপড় নাই।'

খুড়িমার তখন ঘুম ভাঙ্গিল। ভোলাদাদা তখনও ঘুমাইতেছেন। বুড়ী নিজে চারি দিকে খুঁজিল, কিন্তু হেমলতা কোথায়ও নাই। বেলা হইল—হেমলতা ঘরে ফিরিল না। বাড়ীর সকলের মুখ শুকাইল।

খুড়িমা বলিলেন "একথা যেন গ্রামে প্রকাশ না হয়, বলিস্ বৌ বাপের বাড়ী গিয়াছে।"

হেমলতার বাপের বাড়ীতে লোক পাঠান হইল। লোক ফিরিতে না ফিরিতে হেমলতার পিতা মাতা গাড়ী করিয়া শশব্যস্তে মনুনগরে কন্যার অনুসন্ধানার্থ আসিয়া পৌঁছিল।

তাহাদের শোক দেখিয়া গ্রামের লোকের চক্ষে জল আসিল—হৃষীকেশ শোকে অধৈর্য্য হইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল, বুক চাপড়াইতে লাগিল, এবং যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে 'আমার হেমলতা কোথায় গিয়াছে দেখিয়াছ?' হেমলতার মাতার অবস্থাও ততোধিক। দুই জনেই ক্ষণে ক্ষণে অচৈতন্য হইতেছিল। গ্রামের লোকেরা সঙ্গে যাইয়া তাঁহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

গ্রামে ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সকল বিষয় লইয়া পল্লীগ্রামে যত আন্দোলন হয় তিনটা পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তত হয় না। ইহার একটী গুণ এই যে এ বিষয়ে লোকের খুব সমাজ ভয় আছে।

হেমলতার গৃহত্যাগের পর সমস্ত গ্রামবাসীর একই ভাবনা; ঘাটে, মাঠে, বাজারে, বৈঠকখানায় সর্ব্বত্রই একই কথা 'ভোলা-দাদার স্ত্রী গেল কোথায়?'

ভোলাদাদাকে সকলেই ভাল বাসিত। এ ঘটনায় সকলেই

দুঃখিত হইল। সেই যে অনেক দিন পূর্ব্বে এক গণক আসিয়া বলিয়াছিল ‘ইহাদের মধ্যে একজনের অকস্মাৎ গৃহশূন্য হইবে’ তাহাই ঠিক হইল কি?—তবে ত গণকের কথা সত্য। তখন গণকের কথালিখিত কাগজখানি পিতা বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিলেন, সকলেই তাহা আবার পড়িল এবং পড়িয়া ভীত হইল। পিতা বিষণ্ণবদনে পুনরায় সেই কাগজখানি বাক্স মধ্যে তুলিয়া রাখিলেন।

নবম অধ্যায়।

খবরের কাগজ।

‘দামু বোসে চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যে খানা বড্‌ডই ফেলিয়েছে’।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিজের জীবন চরিত লেখা বিষম দায়। হয়ত ভাল করিতে গিয়া মন্দ হইবে। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য লজ্জা সম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া জীবনের গোপনীয় কথাগুলি লিখিতেছি তথাপি কোন ছিদ্রান্বেষী লোক হয়ত বলিবেন ‘এই টা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা—গণকের কথা এত সত্য কি কখনও হয়?’ বোধ হয় এইরূপ মিথ্যাবাদী অভিহিত হইবার ভয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলব্যক্তিরা নিজের জীবনচরিত লেখেন না।

ভাগ্যক্রমে সে অভিযোগের দায় হইতে মুক্ত হইবার পন্থা আমার আছে। সেই সময়ের দুইখানি খবরের কাগজ আমার কাছে রহিয়াছে তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিব যে গণকের কথা সত্য। খবরের কাগজের কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইতে পারে না। আমি দেখিয়াছি যে সকল লোকের অপরের লিখিত জীবনচরিতে বা ইতিহাসে বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মেও বিশ্বাস নাই, তাঁহারা পর্য্যন্তও খবরের কাগজের কথায় বিশ্বাস করেন। খবরের কাগজ দুখানির লেখা উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে উহাদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন কলিকাতায় "সত্যবার্ত্তা প্রকাশিকা" ও "ধর্ম্মতত্ত্বপ্রচারিকা" নামে দুইখানি খবরের কাগজ ছিল। উভয় কাগজই সমগ্র ভারতবর্ষকে একতাব্রতে ব্রতী করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মিল ছিল না। "প্রচারিকা" যদি সেকালের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিত, অমনই "প্রকাশিকা" সেকালের দোষ ব্যাখ্যা করিয়া অন্যূন তিনটী সুললিত প্রবন্ধ বাহির করিত। "প্রকাশিকা" যে লোকের সুখ্যাতি করিত—"প্রচারিকা" অমনি তাহার ও তাহার চৌদ্দপুরুষের নিন্দাবাদ করিত। এরূপভাবাপন্ন উভয় কাগজে যে ঘটনার সত্যতা বিষয়ে লিখিয়াছে তাহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? এখন উভয় কাগজের লেখা উদ্ধৃত করা যাউক।

[সত্যবার্ত্তা প্রকাশিকা ১৩ই অগ্রহায়ণ ১২৮২।]

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম মন্নুনগর গ্রামে

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী গত ১০ই কার্ত্তিক রাত্রে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার নাম হেমলতা। হেমলতার পিতা পণ্ডিত হৃষীকেশ বিদ্যারত্ন শোকে অধৈর্য্য হইয়াছেন। যদি কেহ হেমলতার অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারেন তবেই বৃদ্ধের পুনর্জীবন হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমাদের ভণ্ডসহযোগী "ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিকা" প্রায়ই অহঙ্কার করিয়া থাকেন যে তাঁহারই কাগজে নূতন খবর বাহির হয়—তাঁহাকে আমরা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি এ খবর তিনি রাখেন কি? স্বীকার করি তাঁহার কাগজে এক আধটা নূতন খবর থাকে বটে কিন্তু সে গুলি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত এবং আষাঢ় মাসেই প্রকাশের যোগ্য। এইরূপ আষাঢ়ে খবর ছাপান বলিয়া সে দিন আমাদের একজন বন্ধু ঐ কাগজকে প্রতারিকা নাম দিয়াছিলেন—আমরা উহাকে "প্রতারিকা" কিম্বা কোন অপ্রিয় কথা বলিতেছি না, কারণ শাস্ত্রে আছে "সত্যংব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং"।

[ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিকা ২০শে অগ্রহায়ণ ১২৮২।)

আমাদের প্রিয়তম সহযোগী "প্রকাশিকা" গত সপ্তাহে আমাদিগকে "ভণ্ড প্রতারিকা" ইত্যাদি বলিয়াছেন, আমরা প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে আরও কটু বলিতে পারিতাম—কিন্তু

"নীচ যদি উচ্চভাসে
সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে"

সেইজন্য অভদ্রোচিত কথা বলিয়া আমাদের ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকাকে কলুষিত করিব না।

সে যাহা হউক প্রিয় সহযোগী যে খবর লিখিয়াছেন তাহা সত্য বটে। আমরাও সে খবর পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য মনুনগরে একজন লোক পাঠাইয়াছিলাম। (মাননীয় সহযোগী "প্রকাশিকার" মত আমরা যে কোন খবর তদন্ত না করিয়া ছাপাই না)। আমাদের প্রেরিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে ঐ গ্রামে বাস্তবিকই ঐ ঘটনা হইয়াছে. আরও এইরূপ ঘটনা যে হইবে তাহা একজন গণক কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ গ্রামে আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল।

ধূর্ত্ত "প্রকাশিকা" মহাশয় গণকের কথা লিখিলেন না কেন? গণকে সত্য বলিতে পারে ইহা আধুনিক মতের বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি শঠতাপূর্ব্বক এ কথা গোপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধূর্ত্তামি গোপন রহিল না—সূর্য্য যেমন মেঘে ঢাকা থাকে না, অগ্নি যেমন তুষে ঢাকা থাকে না, আমাদের অনুসন্ধানের পর প্রকাশিকার ধূর্ত্ততাও তেমনি গোপন রহিল না। এখন বিজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন প্রকাশিকার কেমন গুণ!! প্রকাশিকা নিশ্চয়ই মিথ্যাবা—!!! নিশ্চয়ই জুয়াচো—!!!

আমাদের শেষ কথা এই যে হেমলতার আরও খবর জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম; অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ কোন খবর পাইলে আমাদের জানাইয়া বাধিত করিবেন।"

দশম অধ্যায়।

সমাজ।

"Be whatever you will but yourselves first of all"
Lowell.

তখন মন্নুনগরে একটী ডিবেটীং ক্লব হইয়াছিল—কামাখ্যা তাহার সভাপতি। সভায় "সমাজের অত্যাচার" "স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা" "ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা" ইত্যাদি উচ্চবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হইত। এই ক্লবে কেবল কথার শ্রাদ্ধ দেখিয়া আমি তথায় নিয়মিতরূপে যাইতাম না—কারণ আমার ধারণা এই যে কোন বৃহৎ বিষয় ভাল জানিয়া তাহা সম্পাদন না করা অপেক্ষা একটী সামান্য কার্য্যদ্বারা কাহারও উপকার করা শ্রেয়ঃ।

এক দিন পথে যাইতে যাইতে ঘন ঘন করতালি শব্দ শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিলাম—গিয়া দেখি কামাখ্যাই বক্তৃতা করিতেছে। শ্রোতারা অধিকাংশই বালক কিম্বা যুবক—তন্মধ্যে যাহারা বক্তৃতার কিছুই শুনিতেছে না এবং বক্তৃতার সময় অন্যমনস্ক শ্রোতাদের টীকিতে ও চাদরে বাঁধিয়া দিতেছে কিম্বা টেবিলের নীচে পরস্পরকে চিম্‌টী কাটিতেছে, তাহারা আবার হাততালি দিবার সময়

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হাততালি দিতেছে এবং দেখাইতেছে যে তাহারা বক্তৃতায় সম্পূর্ণ মোহিত হইয়াছে।

সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাষায় কামাখ্যা হিন্দুসমাজের ঘোরতর অত্যাচারের বিষয় বলিল এবং "হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিয়া ফেল, হিন্দুনাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেল, প্রাচীন উন্নতশৃঙ্গ দেবালয়কে ভূমিসাৎ কর, দেবতাকে নদীর জলে ফেলিয়া দাও এবং ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন মনে দিনযাপন কর" বলিয়া ঘন ঘন ও বহুক্ষণস্থায়ী করতালির মধ্যে উপবেশন করিল।

আমি সভাগৃহ হইতে বিরক্ত হইয়া কুশদিদির আশ্রমে যাইলাম। কুশদিদির বাড়ীর অনতিদূরে ভাগিরথী বহিয়া যাইতেছে। তার সম্মুখেই একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ—২০।২৫ টা ডাল নামিয়া মাটীতে পড়িয়াছে—বৃক্ষতলে তুলসী গাছ এবং পূজার জন্য বেল মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের গাছ। দ্বিপ্রহর বেলায়ও ঘনপত্ররাজি ভেদ করিয়া এ স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না—সেইজন্য এই শীতল স্থানটীকে আমরা "কুশদিদির আশ্রম" বলি।

তখন কুশদিদি অশ্বথ বৃক্ষের ডালে ঝুলান পিঞ্জরাবদ্ধ ময়না পাখীকে কৃষ্ণনাম শিখাইতেছিলেন—মানুর মা গল্প করিতেছিল। আমি তথায় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া কথায় কথায় কামাখ্যার বক্তৃতার কথা বলিলাম।

মানুর মা বলিল,—

"দাদাবাবু আজকাল কেমনতর হ'চ্চেন—হিঁদুর ছেলে ও সব কেন?"

কুশদিদি। এখনকার ছেলেদের কথা ব'ল না, কথায় বলে—

'তোদের ঘাড় কেন কাৎ ?'
"আমরা ওই এক জাত।"

মান্নর মা। ঠিক ব'লেচেন।

হে বঙ্গীয় যুবকগণ! এই দুইটী দৃশ্যের তারতম্য কত? এবং ইহা দেখাইবার অর্থ কি? যদি সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাও, তবে নিজে কোথায় দাঁড়াইয়াছ তাহা দেখিও এবং তথায় দৃঢ়রূপে পদ রাখিয়া তবে উন্নতির শাখা ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিও—মোহে কালিদাসের মত যে শাখায় বসিয়া আছ, তাহাই কাটিও না। আমি এই সমাজের চিত্রে ইহাই বুঝাইতে চাহি। সমাজপ্রেম ও উন্নতি এক পথেরই পথিক—যিনি সমাজ ত্যাগ করেন তিনি কখনই সমাজের উন্নতি করিতে পারেন না—সে অবস্থায় শান্তি নাই—ইহাই দেখাইবার জন্য আপনাদের সম্বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

একাদশ অধ্যায়।

গঙ্গাতীরে ভ্রমণ না বিদেশ যাত্রা ?

"It is a hard world, and sleep
Is about the best thing, in it."
Rider Haggard's "Colonel Quartich V. C."

এই সময়ে পিতামাতা আমার বিবাহের স্থির করিলেন। আমাদের মনুনগরের বাড়ীতে মহা আনন্দ—দুই চারিজন কুটুম্বসাক্ষাৎও আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেরা বরযাত্র ঠকানে প্রশ্ন শিখিবার জন্য কুশদিদির তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে মহা আয়োজন। কিন্তু "যার বে তার হুঁস্ নাই পাড়াপড়সীর ঘুম নাই" দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

আমি কুশদিদির বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম 'আমি বে কর্‌ব না।'

কুশদিদি বলিলেন,

"যার জন্য পাতি ফাঁদ
সে হল আকাশের চাঁদ—

মহির সঙ্গে বে হবে না ব'লে তুই বে ক'রবিনি কেন ? আমি তোর বাবাকে এত বুঝাইয়া বলিলাম মহিমার মত 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী' মেয়ে কেহ কখন দেখে নাই, কিন্তু তিনি গরিবের মেয়ের সঙ্গে বে দিতে সম্মত হ'লেন না—তাই ব'লে কি তুই চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি।"

আমি। 'তাতে আর দোষ কি ?'

কুশদিদি। তোর প্রপিতামহরা তাদের মাথায় যত চুল ছিল তত বে কোর্‌তো আর তুই একটাও বে কোর্‌বি নি?

আমি। 'বহুবিবাহের প্রথা ত প্রায় উঠিয়া গেল। এই দেখ ভোলাদাদা কামাখ্যা কেহই ত বহুবিবাহ করে নাই। আর আমি এখন একটীও বিবাহ করিব না।'

কিন্তু আমার বারণ কেহ শুনিল না। সকলে বলিল—'বিবা-হের সময় সকল ছেলেই অমন আপত্তি করে।' আমি দেখি-লাম কথার দ্বারা বিবাহ বন্ধ হইবে না এবং নিশ্চেষ্ট থাকিলে আর তিনদিনের মধ্যে আমার জন্মের মত হাত বাঁধা হইবে। অতএব মনে মনে একটা ঠিক করিলাম। পরদিবস গায়ে হলুদ হইবে; সেদিন যেমন রোজ সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে যাই তেমনই যাইলাম; তবে প্রভেদ এই যে জমান পঞ্চাশটী টাকা পকেটে লইলাম, আর গঙ্গাতীরে না বেড়াইতে গিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে যাইলাম ও লুকাইয়া কাশীর টিকিট কিনিয়া ট্রেনে উঠিলাম। যখন বাড়ী ফিরিবার সময় হইল তখন আমি বর্দ্ধমানের নিকট। গাড়ীতে একটু আনন্দ হইল—বাড়ী যেন কণ্টকময় হইয়াছিল। ট্রেন ছাড়িলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এক একবার মনে হইল 'মা কত কাঁদিবেন'—কিন্তু হাত বাঁধার কথা মনে পড়ায় বাড়ীর উপর রাগ হইল—তাই নিঃশঙ্ক ও প্রফুল্লচিত্তে বিদেশে চলিলাম।

ইহার দুই বৎসর পরে আবার মন্নুনগরে আসি। এই দুই বৎসরে এত কাণ্ড হইবে যদি পূর্ব্বে জানিতাম তাহা হইলে কি এতদিন বিদেশে থাকিতাম? কিন্তু সে কথা যথাস্থানে বলিব।

আঁকিয়া দিন যাইত। একদিন আরতি সমাপনান্তে রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় বাসায় ফিরিতেছি পথে দশাশ্বমেধঘাটে একটু দাঁড়াইলাম। সম্মুখে সেই চিরপরিচিত বাঁকা মন্দির,পার্শ্বে আকাশ ভেদ করিয়া বেণীমাধবের ধ্বজা উঠিয়াছে, তর্ তর্ বেগে উত্তর-বাহিণী গঙ্গার জল পাথরের বাড়ীর সংঘর্ষণক্রোধে যেন আরও বেগবান্ হইয়া শান্তি আশে সাগরোদ্দেশে ছুটিতেছে। গগনে চন্দ্রমা নাই,কিন্তু তারকারাজি সকলে মিলিয়া একটা মধুর কিরণ ছড়াইতেছে। যে মানমন্দির হইতে জ্যোতির্বিদ্গণ পুরাকালে তারকানিচয় দেখিতেন এখন সেই মানমন্দির ভগ্ন দেখিয়া তারকাগণ যেন মানবকীর্ত্তির অস্থায়িত্ব ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তখন নৈশগগনের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমধুর বামাকণ্ঠে ছাদের উপর হইতে একজন গাইল—

১

"কাঁহা চলত রে ভাই ?
নয়ি যাতা সাগরে,
মেঘ গিরি কন্দরে,
তারা রবি পাথরে,
তুয়া কাঁহা যাই ?

২

পাণি মাগে চাতক,
বায়ু মাগে পাবক,
রাধা মাগে শ্যামক,
তুয়া কেয়া চাই ?"

৩

"হাম্ যাহে অনুসরি,
সবআউ নাম দেই,
এতে দিন যাপই,
কাঁহা তাহে পাই?

৪

হৃদয় তিয়াসল,
তিয়াসা ন মিটল,
উণমতি প্রাণ ভেল,
দরশন নাহি।"

এই গান শুনিতে শুনিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেখানে দাঁড়াইয়া আছি—সমস্ত শরীর মনের মত সেই গানের গুণে অবশ হইয়া আছে—এমন সময়ে দেখিলাম সম্মুখে গঙ্গার ধারে কে এক জন রমণী বসিয়া আছে—কাণ পাতিয়া শুনিলাম সে কাঁদিতেছে। আহা! কে এ কাঁদিতেছে? না জানি তার কতই কষ্ট! কি দীর্ঘনিশ্বাস! আমি নিকটে যাইলে রমণী আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

'আপনি কে? এখানে বসিয়া কাঁদিতেছেন কেন?

রমণী মুখ তুলিয়া বলিল "আপনি কে? ও গলার স্বর যেন আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি।"

আমি। 'আমার নাম শ্রীঅমৃত লাল চৌধুরি—আমার বাড়ী মন্নুনগরে।'

রমণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল—আর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আমি। 'আমাকে চেনেন্ নাকি ?'

রমণী। "যদি জিজ্ঞাসা করিলেন বলি—কাহাকেও অন্তরের কথা না বলিতে পাইয়া আমার বুক ফাটিতেছে—আমি অভাগিনী হেমলতা—আপনি বোধ হয় আমাকে ভুলেন নাই। এমন লোক পাই নাই যাহাকে আমার দুঃখের কথা বলি ; যে না হাসিয়া, সকল কথা মনোযোগ দিয়া শুনে। গৃহ হইতে আসিয়া অবধি আমি ছিন্নলতার মত দিন দিন শুকাইতেছি—

আমি। 'হেমলতা! তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হইবে আমি ভাবি নাই—তুমি কেন গৃহত্যাগ করিলে ? তোমার জন্য তোমার পিতামাতা কত যে কাঁদিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না —তুমি কি ভয়ানক শীর্ণা হইয়া গিয়াছ !'

হেমলতা ঘাড় হেঁট করিল। তার চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু সেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার স্বচ্ছ জলে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। একটু শান্ত হইয়া ধীরে ধীরে হেমলতা এই কথা গুলি বলিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পাপ, প্রলোভন ও হেমলতার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা।

"How small of all that human hearts endure
That part which kings or laws can cause or cure."

Johnson.

হেমলতা বলিল—

"আমি যে বাঁচিয়া আছি ইহাই আশ্চর্য্য—কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সকল কথা বলি। যখন মন্নুনগরে ছিলাম কোন কোন দিন ননদ ও স্বামীর সহিত মনের অমিল হইত—চিরদিনই মনে হইত কেহ আমাকে ভালবাসে না। উপন্যাসে যে ভালবাসার কথা পড়িতাম তাহা স্বামীর কাছে পাইলাম না—তিনি দিবানিশি অন্যমনস্কে মাথামুণ্ড কি লিখিতেন ও বকিতেন তাহা বুঝিতাম না—আমাকে কখনও দুটো আদরের কথা বলিতেন না। ক্রমে ক্রমে স্বামীতে আর আমার মন রহিল না, তাঁহার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতাম; সর্ব্বদাই মনে গ্লানি ও রাগ হইত। আমি ঘরের বৌ ছিলাম দেখিতে শান্ত, কিন্তু মরমের ভিতর সর্ব্বগ্রাসী জ্বলন্ত প্রবল অগ্নি ছিল।

"সেদিন গিয়াছে, এখন বলিতে লজ্জা নাই—একদিন স্বামীর সহিত তুচ্ছ কথায় কলহ হইল—তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলাম

তাঁহাদের সকলকে জব্দ করিব। কিন্তু হায়! তাহা করিতে গিয়া নিজে কি ফাঁদেই পড়িলাম।

"একজনের সঙ্গে (তাঁহার নাম করিব না) গৃহত্যাগ করিলাম—তিনি আমাকে বলিলেন 'আমি প্রাণের অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসি; তুমি দেহ, আমি ছায়া; দুজনে কখনও এজীবনে পৃথক্ হইব না; চল বিদেশে যাই, আমি চাকরী করিব ও দুইজনে অসীম সুখে থাকিব।" তাঁহার সহিত গৃহত্যাগ করিয়া এই কাশীতে আসিলাম।

"একমাস কাল দুজনে এক রকমে কাটিল, কিন্তু তার পরই পরস্পরকে বিষ জ্ঞান হইতে লাগিল—বুঝিলাম তিনিই আমার সর্ব্বনাশ করিলেন। ইহার পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম যতদিন পৃথিবীতে মনুষ্য আসিয়াছে ততদিন হইতে কেহ কখনও পাপ প্রণয়ে সুখী হয় নাই—কিন্তু সে কথা মনে স্থান পায় নাই। জন্মের মত অপবিত্র হইয়া তবে সে কথার সত্যতা ভাল রূপে বুঝিলাম।

"ছোট ছোট কথা লইয়া দুজনে মনের অমিল হইতে লাগিল। আবার মলিনতা আসিয়া আমার মন ছাইয়া ফেলিল। তখন ভাবিলাম, 'কেন সংসার ত্যাগ করিয়া, স্বামী, পিতা, মাতা, সকলকে ছাড়িয়া আসিলাম? তাঁহাদের যে কষ্ট দিয়াছি ততোধিক কষ্ট আমার কপালে আছে!' এই ভাবিয়া সেই পুরুষের প্রতি ঘৃণা হইল।

"তিনি একদিন আমাকে বলিলেন,

'তুমি আর আমাকে ভালবাস না—'

আমি বলিলাম 'আপনি বাস না তাই বল—আমার দোষ দাও কেন?'

তিনি বলিলেন 'যদি ভাল বাস তবে আমার কাছে সে হাসি নাই কেন?'

"আমি হাসিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু আবার দুঃখ আসিয়া আমার হৃদয় বেষ্টন করিত—বুঝিলাম ইনিই জন্মের মত আমার হাসি কাড়িয়া লইয়াছেন।

"খরচের জন্য তিনি আমার সমস্ত গহনাগুলি লইয়াছিলেন—কেবল হাতের বালাটী ছিল। পাপিষ্ঠা হইয়াও হাতের বালার উপর কেমন একটা মমতা ছিল—তিনি বালা চাহিলে আমি তাহা দিতে অস্বীকার করিলাম। জোর করিয়া বালা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেও আমি বাধা দেওয়াতে, তিনি আমায় প্রহার করিলেন—এবং দেওয়ালের গায়ে সজোরে আমাকে ফেলিয়া দিলেন—দেওয়ালের একটী পেরেক আমার চোখে ফুটিয়া গেল। অত্যন্ত যন্ত্রনা পাইয়া আমি অচৈতন্য হইলাম!

"রাত্রে ঝি একজন ডাক্তার আনাইয়াছিল। পর দিবস প্রাতে জ্ঞান হইলে দেখি হাতে বালা নাই এবং তিনিও ঘরে নাই—সেই অবধি আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই নাই। তার পর ঝিকে দিয়া এই হাতের নোয়া কিনিয়া পরিয়াছি—কে জানে কেন এখনও এই নোয়াটীকে এত ভালবাসি।

"বড় ইচ্ছা আছে যিনি আমায় জন্মের মত এমন করিলেন তাঁহার আমি সর্ব্বনাশ করিব—অন্য কোন রূপে না পারি এই ছুরিকা তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিব—সেইজন্য ইহা নিয়তই আমার নিকট থাকে। এই আশায় বলবতী হইয়া আত্মহত্যা না করিয়া এই দুঃখময় জীবন ধারণ করিতেছি। কিন্তু তিনি

আর এখানে আসেন না—এখন হয়ত ভদ্র সমাজে বেড়াই-তেছেন। আমি গঙ্গাজল হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—যে যিনি আমার এই অবস্থা করিলেন তাঁহার আমি সর্ব্বনাশ দেখিবই দেখিব।

"আমি এখন চরকা কাটিয়া অতিদুঃখে দিনপাত করিতেছি—কোন দিন সুতা বেচিয়া পয়সা পাই, কোন দিন আবার অসুখ হইলে তাহাও পাই না। আমাকে এখানে কেহ দেখে না—আমি একেলা নিয়ত কত যন্ত্রণাই ভোগ করি!

"হায়! কেন গৃহের আশ্রয় ছাড়িলাম? কেন সোণা ফেলে আঁচলে গেরো দিলাম? ধর্ম্ম পথে থাকিয়া গৃহে রহিলে আজ কি সুখেই থাকিতাম!

"সুখ, স্বচ্ছন্দ, স্বাস্থ্য,সকলি তখন ছিল—যতদিন তাহা ছিল ততদিন তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই। এখন অন্য সকলের সহিত শরীরের সুস্থতাও হারাইয়াছি। আমার প্রায়ই এখন অসুখ করে—এখানে আমার অসুখে কেহ দেখিবার নাই—সাতদিন না খাইলে কেহ খাইতে বলিবে না—যদি গৃহে থাকিতাম তবে আজ কত লোকে আমাকে যত্ন করিত!"

এই বলিয়া হেমলতা আবার কাঁদিতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—ভাবিয়া ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিলাম

'হেমলতা! তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহা আর ফিরাইবার কাহারও সাধ্য নাই। এখন এই ধর্ম্ম স্থানে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মন দাও।'

হেমলতা। "আমিও জানি আমি যে কাজ করিয়াছি

তাহা ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই। এই পাপের জন্য যত দিন বাঁচিব ততদিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা পালন করিব—স্ত্রীলোক কোমলপ্রাণা শুনিয়াছেন; কিন্তু প্রতিহিংসায়, রাগে কিম্বা অন্য কারণে উত্তেজিত হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় দৃঢ়মতি আর কেহই হইতে পারে না।”

আমি। ‘হেমলতা! আমি কি তোমার কোন উপকার করিতে পারি?’

হেমলতা। “আজ যাহা শুনিলেন একথা কাহাকেও বলিবেন না। স্বামী (আমার স্বামী বলিতে পারি না) কেমন আছেন? আমার বাপের বাড়ীর খবর জানেন কি?”

আমি। তাঁহারা সকলে ভাল আছেন।

হেমলতা। “আপনি কাশীতে আসিয়াছেন কেন?”

আমি সে সমস্ত কথা হেমলতাকে বলিলাম।

হেমলতা ক্ষণেক পরে বলিল “অমৃতবাবু! আপনি আর এ পাপিষ্ঠার কাছে থাকিবেন না”।

তখন ধীরে ধীরে হেমলতার কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় আসিলাম। আসিতে আসিতে যতবার ফিরিয়া দেখিলাম —দেখি হেমলতা সেই ঘাটে বসিয়া আছে—কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতেছে। কখন সে উঠিবে? অনুতাপে আজ কি সমস্ত রাত্রি হেমলতা সেই খানে বসিয়া কাঁদিবে?

তার পর যতদিন কাশীতে ছিলাম আর হেমলতার সঙ্গে দেখা হয় নাই।

কিন্তু সেই যে দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রথম ছায়ার ন্যায়, পরে দুঃখের জীবন্ত ছবির মত, হেমলতাকে দেখিয়াছিলাম তাহা প্রায়ই মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদয় হইত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্বস্মৃতি—মহিমা কোথায় ?

"Friends of my youth, oh! where are they?
And echo answered "where are they?"

কেন সতীশচন্দ্রের কথামত এই জীবনচরিত লিখিতে সম্মত হইয়াছিলাম ? যে ক্ষতচিহ্ন শুকাইয়া গিয়াছে তাহা কেন আবার কাটিয়া যন্ত্রণা পাই ? একে একে গত জীবনের সুখ দুঃখের সকল কথাই মনে পড়িতেছে—লিখিবার সময় পুনরায় কত দুঃখ ও নিরাশা মনে জাগিয়া উঠিতেছে—এ বৃদ্ধ বয়সে বহুকাল পূর্ব্বের সেই দিন, সেই ক্ষণ, যেন আবার দেখিতে পাইতেছি। যাহা হউক যখন লিখিতে স্বীকার করিয়াছি তখন আর ভাবিলে কি হইবে ?

হেমলতা ঠিক বলিয়াছিল—এক্ষণে আমার মধুনগরে প্রত্যাগমন করাই উচিত—কিন্তু যাই না যাই করিয়া আরও তিন মাস কাল অতিবাহিত হইল।

এই তীর্থাগ্রগণ্য কাশীধামে দুই বৎসর থাকিয়া আমার হৃদয়ে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের সঞ্চার হইল—আবার সেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নানাগুণ দেখিতে পাইলাম—বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের জীবনক্রিয়া দেখিয়া এবং তাহাদের সহিত শাস্ত্রালাপে বুঝিলাম যে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার আবাসভূমি এই হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন গতি নাই। কালচক্রে যাহা গড়িয়াছে সেই ভিত্তি বজায় রাখিতে হইবে, নূতন গঠন এখানে কখনই টিকিবে না।

এক দিন 'সত্যবার্ত্তাপ্রকাশিকা' খবরের কাগজে বিবিধ সংবাদস্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদটী দেখিলাম—

'আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মনুনগরের জমিদার রামরাম চৌধুরী গত ১২ই পৌষ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান অমৃতলাল চৌধুরী বিবাহে অমত করিয়া আজ প্রায় দুই বৎসর হইল কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না।'

পিতার মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া আমি প্রায় জ্ঞানহারা হইলাম। তখন মনে হইল 'হায়! কেন গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম? —পিতার সে বাহ্যিক কঠোর ভাবের মধ্যে আমার প্রতি কত স্নেহই ছিল!—কেন এত দিন বাড়ী ফিরি নাই? 'সে দুঃখের কথা অধিক লিখিব না।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় কাশী হইতে বাড়ী ফিরিলাম। রহিল চাকরী, বিদেশের বাসা; ফুরাইল আরতি দেখা; যেমন আসিয়াছিলাম—একাকী, একাকী তেমনই কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। কিন্তু সেরূপ প্রফুল্ল মনে নয়।

পরদিন প্রাতে মনুনগরে পৌঁছিলাম। আবার সেই মনুনগর

—সেই গঙ্গাতীরে শ্যামসুন্দর ঘাট ও মন্দির—দূরে সেই হরিপুরের সপ্তচূড়শিবমন্দির—ঘাট হইতে উঠিয়া সেই অশ্বত্থবৃক্ষ ও রাস্তা—সেই বাল্যসখা কামাখ্যার বাড়ী যাইবার পথ—প্রায় সকলি সেইরূপ আছে। কিন্তু মহিমা ?—শুনিলাম মহিমা মন্নুনগরে নাই!—আজ প্রায় এক বৎসর হইল সে কোথায় গিয়াছে—কোথায় কেহ বলিতে পারে না—কামাখ্যাও তার কিছু দিন পরে মন্নুনগর অন্ধকার করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে!—শুনিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মহিমা ও কামাখ্যা! তোমরা কোথায় ? কেন গৃহত্যাগ করিলে ? কোথায় যাইলে তোমাদের পাইব ? আমি কত আশা করিয়া আসিতেছি আবার সেই বীণাস্বরনিন্দিত স্বরে মধুর কবিতা, গান ও যুক্তি শুনিব—আমার অদৃষ্টে শান্তি নাই—তোমাদের না পাইলে আমার ভগ্ন হৃদয় সম্পূর্ণ হইবে না। রত্ন না হারাইয়া কে কবে রত্নের প্রকৃত মূল্য জানিয়াছে ?

আমি কি একবার বিদেশে যাইয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিলাম ? চক্ষের জল মুছিতেছি—কিন্তু কেহ আমাকে বলিতে পারেন এই আকাঙ্ক্ষার অন্ত কি ? এই যে কাঁদিয়া আশা মিটে না, ভাবিয়া আশা মিটে না—যাহা চাই তাহা যদি পাই তবু ও প্রাণ শান্ত না—ইহার অর্থ কি ? এত শোক কোথায় মিশিবে ?

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—oo—

ভোলাদাদার চিঠি অন্বেষণ এবং কুশদিদির কথা।

" A sweet forgetfulness of human care."

Pope.

ভোলাদাদা কি মহিমার অনুসন্ধানে কোন সাহায্য করিতে পারিবেন? ভোলাদাদার যে স্মরণ শক্তি তদ্দ্বারা সাহায্যের সম্ভাবনা অতি অল্প বোধ হইল। তথাপি ভোলাদাদার বাড়ীতে যাইলাম—সে বাড়ীতে তখন কেবল ভোলাদাদা ও তাঁহার খুড়িমা ছিলেন। সুষমা ও মানুর মা কামাখ্যার বাড়ীতে আছে। আমি যখন ভোলাদাদার বাড়ী যাইলাম তখন তিনি সেই প্রাচীন পাঠগৃহে ছিলেন—পুস্তকে এত মন সংযোগ হইয়াছিল যে আমাকে দেখিতে পাইলেন না। আমি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিলাম ভোলাদাদা সতরঞ্চের উপর শুইয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন, যখন পুস্তকখানির দক্ষিণ পৃষ্ঠা পড়িতেছেন তখন তিনি দক্ষিণদিকে পাশ ফিরিতেছেন এবং যখন বামপৃষ্ঠা পড়িতেছেন তখন বামদিকে গড়াইতেছেন। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে ভোলাদাদা সসম্ভ্রমে উঠিয়া আমাকে বসাইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

"কি ঘোঁষের পো ভাঁল আছ ত ?"

আমি বলিলাম 'কি ভোলাদাদা! আমাকে শুদ্ধ ভুলে গেলে ? আমি ত ঘোষের পো নই—আমি অমৃত।'

ভোলাদাদা অপ্রতিভ হইলেন না, বলিলেন "তোমার মুখটী অনেকটা ঘোষেদের যাঁদুর মত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ভোলাদাদা! মহিমা যাইবার পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছিল কি ?'

ভোলাদাদা। "না কিঁছুই ত বলে নাই।"

এই বলিয়া ভোলাদাদা চক্ষু মুদিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন, এবং অনেকক্ষণ ঐরূপ করিয়া বলিলেন "হাঁ হাঁ মানুর মা একখানি চিঁঠি রাঁখিয়া গিয়াছিল—বলিয়াছিল মহিমার চিঁঠি, তোমাকে দিতে হবে।"

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম 'ঐ চিঠি খানি কোথায় ?' এবং আগ্রহে ভোলাদাদার হাত ধরিলাম।

ভোলাদাদা বলিলেন "আমার হাঁত ছাঁড়—দাঁড়াও মনে করি—"

ভোলাদাদা আবার চক্ষু মুদিয়া ঘাড় বাঁকাইলেন এবং আধ ঘণ্টা পরে মাথা নাড়িলেন—আমি বুঝিলাম ভোলাদাদার মনে পড়িল না। আবার ক্ষণেক ভাবিয়া "ঠিঁক হয়েছে" বলিয়া ভোলাদাদা জামার পকেটে হাত দিলেন—পকেট কিন্তু শূন্য। তার পর "এই বার ঠিঁক হয়েছে" বলিয়া আলমারি খুলিলেন—তার ভিতর ভোলাদাদা ও আমি খুঁজিলাম, চিঠি পাওয়া গেল না। শেষে ঘরের সমস্ত জিনিষ উল্টা পাল্টা করিয়া দেখা হইল—কুলঙ্গিতে, সতরঞ্চের নীচে, মশারির চালে, ছাদের উপর, সকল স্থানেই খুঁজিলাম—কিন্তু কোথায়ও চিঠি পাইলাম না। চিঠি খানি পাইলে মহিমা ও কামাখ্যাকে পাইব—এই ভাবিয়া চিঠির জন্য বড়ই আগ্রহ

বাড়িল—করযোড়ে ভোলাদাদাকে বলিলাম 'ভোলাদাদা! তোমাকে মিনতি করি, চিঠি খানি কোথায় রাখিলে স্মরণ করিয়া বল।'

ভোলাদাদা আবার চক্ষু মুদিলেন—কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর চক্ষু দিয়া দুই তিন বিন্দু জল পড়িল, তখন বুঝিলাম ভোলাদাদার আর স্মরণ হইবে না। অগত্যা তথা হইতে বাড়ী ফিরিলাম।

তার পর যাইলাম কুশদিদির আশ্রমে—সে আশ্রম এখন যেন একটু অযত্নে আছে; আর তত সুন্দর নাই। আমাকে দেখিয়া কুশদিদি বলিলেন—

'কি ভাই! বড় ভাবনা—না?

"সাধ ক'রে আমি পুষেছিনু টিয়ে,
চাল ছোলা দিতাম কটোরা পুরিয়ে,
শিকল কাটিয়ে
প্রাণে দাগা দিয়ে
পলাইল নিজস্থান যেখানে।'

আমি। তাইতো পালালো কোথায়?

কুশদিদি। 'ব'লবো'?

আমি। তোমার পায়ে পড়ি—বল না—

কুশদিদি। 'পায়ে প'ড়তে হবে না—এত সন্ধান ক'রলি একবার শ্রীক্ষেত্রে সন্ধান ক'রতে পারিস? যা শুনেছি তাতে বোধ হয় টিয়া পুরুষোত্তমে উড়ে গেছে'।

আমি। এতদিন বলনি? আমি যাবার উদ্যোগ দেখিগে।

ষোড়শ অধ্যায়।

——oo——

কলঙ্ক।

"You shall know that you have wronged me yet" I said; "or you shall never see me again."

Wilkie Collins' Moonstone.

তার পর যাইলাম কামাখ্যার বাড়ী—তথায় সুষমা ও মানুর মা ছিল। আমাকে দেখিয়া সুষমা দালান হইতে ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেল। আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। চিরকাল সুষমা আমার সহিত কথা কহিয়া আসিয়াছে, আজ এরূপ কেন? মানুর মাও আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল—আমি রোদন সম্বরণ করিয়া বলিলাম—

'মানুর মা! আমি সব শুনিয়াছি এবং মহিমার ও আমার বন্ধুর অনুসন্ধান করিতেছি—স্বয়ং সেই উদ্দেশে শ্রীক্ষেত্র যাইব ভাবিতেছি। এই অনুসন্ধানে তোমরা কোন সাহায্য করিতে পারিবে কি?'

মানুর মা বলিল,

"অমৃত বাবু আপনি কোথায় গেছলেন?"

আমি। আমি কাশীতে গিয়াছিলাম—

ঝি। হেমলতা কেমন আছে?

আমি। হেমলতার মত দুঃখিনী এ জগতে আর কেহ নাই—

ঝি। তাকে ছেড়ে এলেন যে?

আমি। সমাজে তাকে নেবে কেন? আর তোমার ভাব আমি বুঝ্‌তে পারচি না—আমি ছেড়ে আস্‌বো কেন?

ঝি। আপনার কাছে সে ছিল না?

আমি। না!

ঝি। না?

আমি। না!—একি রকম কথা?

ঝি। কেন—দাদাবাবু যাবার সময় ব'লে গেছেন আপনি তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যে হেমলতা ও আপনি কাশীতে আছেন। একথা আমি ও দিদিমণি জানি—আর কাহাকেও বলি নাই। সেই জন্যই দিদিমণি আপনার সঙ্গে কথা কইলেন না।

আমি। আর বলিতে হইবে না, এ মুখ আর আমি সুষমাকে দেখাইব না; যদি ধর্ম্ম সত্য হয় তবে এ কথার সত্য নিশ্চয়ই বাহির হইবে। গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিতে পারি আমি হেমলতার গৃহত্যাগের কারণ নই—কিন্তু আমার মুখের কথায় কে বিশ্বাস করিবে? কামাখ্যা ত কখন মিথ্যা কথা কহে না—সে যাহা বলিয়াছে সেই কথাই তোমরা বিশ্বাস করিবে—

ঝি। অমৃতবাবু! আমাদের দোষ ধরবেন না—কি সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা জানি না; আরও দাদাবাবু ও আপনি দুজনেই চিরকাল সত্যবাদী—কাহাকে বিশ্বাস করি?

আমি। মানুর মা! আমার মাথা ঘুরিতেছে—আমি যাই—ইহারা কোথায় গিয়াছে তার কিছু সন্ধান জান কি?

ঝি। না।

মর্ম্মাহত হইয়া আমি কামাখ্যার বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। কি কলঙ্ক! কিরূপে এ ভীষণ অপবাদ দূর হইবে?

সপ্তদশ অধ্যায়।

——oo——

বাসনা, নরক ও প্রেম।

"It was Love old in story, yet new to every human heart."
Ouida's 'Held in Bondage.'

বিপদ একাকী আসে না। পিতার মৃত্যু—মহিমা ও কামাখ্যার দেশত্যাগ—তাহার উপর আবার এই কলঙ্ক! আমার শরীর যেন কি জড়তায় অবশ হইল—বাড়ী হইতে প্রায় বাহিরে আসিতাম না—নিরাশা ও আলস্যে মন যেন তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

একদিন একেলা নির্জ্জীবের মত বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, ভোলাদাদা শশব্যস্তে আসিয়া বলিলেন "সেই চিঠিখানা পাওয়া গেছে—খুড়ি মা বাক্সর মধ্যে রেখেছিলেন—এই সেই চিঠি" আমি ত্রস্ত হইয়া চিঠি লইলাম কিন্তু অন্যমনস্কে ভোলাদাদাকে বসিতেও বলিলাম না—তিনি চলিয়া গেলেন, আমি খাম খুলিয়া পড়িলাম—তাহাতে মহিমার হাতে এই কবিতাটী লেখা:—

(১)

বসিয়া গঙ্গার তীরে
দেখিতেছি মাথা'পরে
চন্দ্রমা চাহিয়া আছে গঙ্গাজল পানে।
কিন্তু সুবিমল জল
বহিতেছে কলকল
গঙ্গা যেন হাসি হাসি খেলা করে বায়ুসনে,
চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে না তাহার মনে।

(২)

বলিতেছে চন্দ্র যেন
"প্রিয়তম গঙ্গে! শুন
বারেক করনা স্থির হৃদয় তোমার,
তোমার অন্তরে দেখি হৃদয় আমার।"
কিন্তু সচঞ্চল জল
বহিতেছে কল্ কল্
গঙ্গা যেন হাসি হাসি খেলা করে বায়ুসনে
চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে না তাহার মনে।

(৩)

তেমনি অমৃত তুমি
তোমা আশে চেয়ে আমি
আমা হ'তে কতদূরে ভ্রমিছ বিদেশে
আসিলে না এতদিনে দুঃখিনী সকাশে।

মহিমা! তুমি এখন কোথায়? তুমি যে আমাকে এত ভালবাসিতে সেকথা একদিন ও বল নাই কেন? হায়! তোমাকে হারাইয়া তার পর ইহা বুঝিলাম। আমার হৃদয়ের

অপূর্ব্ব বাসনা কি পূরণ হইবে? তোমার মন ও আমার মনে প্রকৃত সন্দর্শন কি এ জীবনে হইবে?

মরিবার পূর্ব্বে একদিন যেন সে বাসনা পূরণ হয়—একদিন যেন দুজনে মন খুলিয়া কথা কহিতে পাই (না—কথায় মনোভাব ব্যক্ত হয় না)—একদিন যেন উভয় মনের আপনা ভুলিয়া, পৃথিবী ভুলিয়া, প্রকৃতমিলন হয়! তার পর যতদিন বাঁচিব সেই মিলন স্মরণ করিয়া জীবনের কার্য্য করিব!

মন্মনগরে,দুর্গাপুরে, চারিদিকে অনুসন্ধান করাইলাম, কিছুই খবর মিলিল না। আবার নিরাশা আসিয়া হৃদয় ঘেরিল। ভাবিলাম—কেন আমি মহিমার ও কামাখ্যার অনুসন্ধান করিব? কেন আবার বিদেশে যাই? বিদেশে যাইলে হয়ত আরও কি বিপদ ঘটিবে। কেন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ইহাদের অনুসন্ধানে আমার জীবন অতিবাহিত করিব?

কিছুদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলাম। ক্রমে হৃদয়ে ঔদাস্য আসিল—আর কোন কার্য্যে উদ্যম রহিল না। খাইতে হয় খাই, কাজ করিতে হয় অর্দ্ধেক হৃদয়ের সহিত কাজ করি; কিছুতেই আগ্রহ নাই, স্পৃহা নাই, ব্যাকুলতা নাই।

বলুন দেখি মনুষ্য হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট অবস্থা কি? কুচিন্তা ও পাপকার্য্য? না—পাপী উদ্যমশীল হইলে, পরে তাহার মতি ফিরিতে পারে। কিন্তু যে উদ্যমহীন তাহার আর উপায় নাই। বেঁচে আছি তাই বেঁচে আছি, কোন কার্য্যে তেমন মতি নাই, সৎকার্য্যে প্রয়াস নাই; সমাজের কি কাহারও প্রতি যথার্থ ভালবাসা নাই; সমাজের বা নিজের কিসে উন্নতি হইবে সে চিন্তা নাই—এই উদ্যমহীনতা, এই

ঔদাস্ত, এই জড়তাই মনুষ্যহৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট অবস্থা।

সেই নরক হইতে আমাকে উদ্ধার করিল কে?—প্রেম। প্রেমের জয় হইল। একদিন প্রতিজ্ঞা করিলাম—তাহাদের উদ্দেশে আমি স্বয়ং দেশে দেশে সন্ধান করিব, যতদিন না পাই অন্য কাজ করিব না; যদি ইহাতে প্রাণ যায় তবে ভাবিব এই কার্য্যের জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যেন আবার জীবন পাইলাম। জড়তা আর রহিল না, আবার সংকার্য্যে আকাঙ্ক্ষা হইল। এতদিনে বুঝিলাম কেন এই প্রেমের গুণ সকল কবিই গাইয়াছেন; প্রেম নির্জ্জীবকে সজীব করে, স্বার্থপর মনুষ্যহৃদয়কে পবিত্র করিয়া তুলে।

১৫ই পৌষ ১২৮৬ সালে ভোলাদাদাকে সঙ্গে লইয়া কামাখ্যার অনুসন্ধানে শ্রীক্ষেত্রে চলিলাম। উদ্যমপূর্ণতাই জীবন—উদ্যমহীনতাই মৃত্যু। আমি যে রত্ন হারাইয়াছিলাম—যাহার অভাবে হৃদয় এত অশান্তিময় হইয়াছিল—তাহা কিরূপে পাইলাম সে কথা জীবনচরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিব।



দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ষ্টীমারে।

"জুড়াইতে চাই
কোথায় জুড়াই?
* *
যাই ভেসে ভেসে
কত কত দেশে"
* * গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

অতি প্রত্যূষে ভোলাদাদা ও আমি কলিকাতায় ষ্টীমার ঘাটে আসিলাম। পথে ভোলাদাদা একখানি চসমা ও এক পকেট টেপারি ফল কিনিয়াছিলেন। ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য—"ও রে! শ্যামা! কোথা গেলি রে?" "ঐ বাঁশী

বাজ্‌লো এখনও টিকিট কেনা হ'লো না?" "কাঁইকি ঠিয়া হোউছি? জাহাজ চলি যিব পরা!" "আমার গঙ্গাজলের ঘড়াটা মোছরমান মুটের হাতে দিলি কেন?" ইত্যাদি চীৎকার করিয়া শাকান্নভোজী বাঙ্গালীরা ও পকাল আহারী উড়িয়ারা, মাংস-জীবী সবল ইংরাজদের মত এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে—দেখিয়াও আহ্লাদ হয়। জেটীর উপরে ভোলাদাদা ও আমি অতিকষ্টে উঠিয়া দেখি জেটী লোকে পূর্ণ—একটা সূচ পড়িবার স্থান নাই। আমাদের কষ্ট করিয়া চলিতে হইল না—পিছন হইতে লোকের স্রোতে আমাদের ঠেলিয়া লইয়া চলিল। ভোলাদাদা সেই ভিড়ের মধ্যে হাঁ করিয়া হাওড়ার পুল দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—পিছন হইতে ধাক্কা আসাতে ভোলাদাদা ভূঁড়ি শুদ্ধ সম্মুখের একটা লোকের ঘাড়ে পড়িলেন—সে লোকটা "বাপ্‌রে! মানুষত নয় যেন বরাহ অবতার" বলিয়া ভোলা দাদাকে তিরস্কার করিল। ভোলাদাদা বলিলেন "তুমি গাধা মানুষ কখন বরাহ হয়?" তার পর উভয়ে উভয়কে আরও নানাজন্তুর নামপ্রয়োগ করিল—শেষে ভোলাদাদা চসমা চক্ষে দিয়া বলিলেন—

"মহাশয়! সত্যকথা বলিতে কি আপনিও গাধা নয়, আমিও বরাহ নই—দুজনেই মনুষ্য ও ভদ্রলোক—কলহেনালং।"

ভোলাদাদার কেমন অন্তঃকরণ দেখুন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেই ভিড়ের মধ্য হইতে তিন চারি জন বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইয়া ভোলাদাদার সহিত সেক্‌হ্যাণ্ড্‌ করিলেন—এ যাত্রা ভোলাদাদারই জয় হইল।

সেই জেটীর উপর আর একটু যাইয়া ভোলাদাদা যখন

অন্যমনস্কে একখানা ষ্টীমার ছুটিতেছে দেখিতেছেন তখন জনতার তাহাকে একেবারে শূন্যে লইয়া উঠিল—আমার ভয় হইল ভোলাদাদা বুঝি জেটীর ধারে গঙ্গায় পড়িয়া যান, ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না—এবং তিনি কিছুক্ষণ শূন্যে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় মৃত্তিকায় পা দিলেন।

এত ঘটনার পর ভোলাদাদা ও আমি 'চঞ্চলা' ষ্টীমারে উঠিলাম। জাহাজ ছাড়িবার পর দেখি ভোলাদাদা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিছুই আনেন নাই—কাপড়ের পোঁটলা না আনিয়া একটা বাক্সে কাগজের দপ্তর আনিয়াছেন—খাবারের হাঁড়ির পরিবর্ত্তে একটা তৈলের ভাঁড় আনিয়াছেন! ভুল হইয়াছে দেখিয়া ভোলাদাদা বলিলেন,

"ঝিঁ সব ঠিক করিয়া রাঁখিয়াছিল আমি তাঁড়াতাড়িতে কি আন্‌তে কিঁ এনেছি। মাঝিদের এঁকবারটী জাঁহাজ থামাতে বল আমি দৌড়ে যাঁব আর জিনিস গুলো আন্‌বো। আমি চসমা চোঁখে দিয়ে ওদের বঁললে ওরা নিশ্চঁয়ই শুন্‌বে।"

আমি ভোলাদাদার হাত ধরিলাম এবং বলিলাম,

"আরে কর কি? লোকে পাগল বলিবে যে?"

এদিকে ষ্টীমারের যাত্রীরা হাত ধরাধরি দেখিয়া তামাসা দেখিতে দৌড়িয়া আসিল, এবং যখন ভোলাদাদার ভুলের কথা শুনিল তখন আশাতীত তামাসা দেখিয়া সকলে উচ্চৈঃ-স্বরে হাসিয়া উঠিল। ভোলাদাদা রাগিয়া নাকে কথা কহিয়া বলিলেন,

"তোমাদের কিঁ? তাঁড়াতাঁড়িতে কাঁর না ভুঁল হয়? সকল পাঁখীই মাছখায়, ধঁরা পঁড়েছে মাছরাঙ্গা"।

যাত্রীদের মধ্যে একজন বলিল "এমন ভুল কাহারও হয় না। হাতী নিজের শরীরের ভার টের পায় না। বাপ মা তোমার ঠিক নাম রেখেছেন, বেঁচে থাক বাপু।"

এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যাত্রীরা স্ব স্ব স্থানে গেল। এবারে ভোলাদাদার হার হইল—এবং ভোলাদাদা ৫ মিনিটকাল মাথায় হাত দিয়া সেই কাগজের দপ্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন —কিন্তু তার পরই সেইভাব ভুলিয়া গেলেন।

ওদিকে খালাসীরা অতি মধুর স্বরে কেহ 'পানি এক বাম', 'পানি দো বাম', 'পানি মিলে না' কেহ বা 'ফুল ফোর', 'বেকারিজে', 'ফরার্ড' বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া ভোলাদাদার মনে বড়ই আনন্দ হইল—তখন তিনি গুণ গুণ করিয়া জাহাজের শব্দে মিশাইয়া গান গাহিতে লাগিলেন এবং পকেট হইতে টেপারি বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। গেঁওখালিতে পৌঁছিয়া কেনালে প্রবেশ করিলাম—তার পর কালীনগর, ভাইটগড় প্রভৃতি স্থান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিতে লাগিলাম। লক গেটের দ্বারা কেনালের জল কিরূপ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা দেখিয়া ভোলাদাদা ইংরাজবুদ্ধির যথোচিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন 'এই গুণেই ইহারা রাজা হইয়াছেন; আর আমরা ভেড়ার দঁল, পারি কেঁবল পরস্পরকে ছঁড়া কাটাইয়া গালি দিতে' (যাত্রীদের তামাসা বোধ হয় ভোলাদাদার মনে পড়িয়াছিল)।

যতদূর দুই চক্ষু যায় ততদূর দেখি জাহাজের দুই পার্শ্বে সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র—তখন ধান পাকিয়াছে, উল্লাসে কৃষকগণ ধান কাটিতেছে এবং এইবার মহাজনের সমস্ত ধার

পরিশোধ করিয়া, জমিদারের খাজনা দিয়া, সম্বৎসরের সম্বল ঘরে রাখিব এই আশায় মনের আনন্দে কত কথাই ভাবিতেছে। দুরাশা! আবার শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কৃষক! তোমাকে মহাজনের শরণাগত হইতে হইবে। এ জন্মে আর মহাজনের শরণাগত হওয়ার দায় তোমার ঘুচিল না। তোমার দুঃখ বুঝিবে কে?

কৃষকগণের সে দুঃখের কথা ভোলাদাদার মনে হইল না। এজন্য কেহ তাহাকে নিন্দা না করেন—বাঙ্গালার অধিক লোকেই আমাদের ভোলাদাদার ন্যায়। তিনি সেই সুবর্ণ-ফলিত ধান্যক্ষেত্রের মনোরম শোভা দেখিয়া বালকের ন্যায় হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার গুণ বর্ণনা করিয়া মনে মনে কয়েক ছত্র কবিতা রচনা করিলেন।

এইরূপে সুখে দুঃখে দুইদিবস ষ্টীমারে থাকিয়া আমরা অবশেষে বালেশ্বরে পৌঁছিলাম। কটক অবধি টিকিট কিনিয়াছিলাম, কিন্তু ষ্টীমারযাত্রা আর ভাল লাগিল না—বালেশ্বর হইতে পদব্রজে কটকে যাইব স্থির করিলাম।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

নীলগিরি।

"See the mountains kiss high heaven
And the waves clasp one another;
No sister-flower would be forgiven
If it disdained its brother."

Shelley.

অতি প্রত্যূষে আমরা 'জগন্নাথ সড়ক' দিয়া বালেশ্বর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। এই রাস্তায় অনেক লোক চলে। কোথায় দেখি দলে দলে হিন্দুস্থানী স্ত্রী ও পুরুষগণ শ্রীক্ষেত্রে চলিয়াছে—তাহাদের পথের সম্বল প্রায়ই এক লোটা ও ছড়ি মাত্র—তাই লইয়া হাসিতে হাসিতে "জগন্নাথিয়া রে ভাই!" গান গাইতে গাইতে কতদুর হইতে তাহারা আসিতেছে—মনুষ্যের অভাব যত বৃদ্ধি কর ততই বৃদ্ধি পায়। কোন বৃদ্ধা ক্ষত পদে ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া এত দূর আসিয়াছে, কিন্তু এখন আর চলিতে পারে না—পথের ধারে বসিয়া স্বামীর আনীত জল পান করিতেছে—লাল কাপড় পরা নীল ওড়না গায়ে দেওয়া তাহার পুত্রবধূটী পা টিপিয়া দিতেছে—এমন তীর্থ না করিলে নয়। ধন্য হিন্দুধর্ম্ম! কে বলে তোমার বন্ধন শিথিল হইয়াছে? কোথায়ও বাঙ্গালী যুবতীগণ শকট হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতেছে—বন্ধনমুক্ত গাভীর ন্যায়

গৃহপ্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা নাই মাথার কাপড় পায়ে পড়িয়াছে—হিন্দুস্থানীদের দেখিয়া লজ্জা নাই কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী দেখিয়া আবার ঘোমটা দিতেছে! কোথায়ও দলে দলে উড়িয়াগণ জগন্নাথসড়কে পৌঁছিয়াই টিপ্ ক'রে নমস্কার করিতেছে—প্রায় সকলেরই হাতে এক একটী আফিঙের পুঁটলী—তাহাদের দেখিয়া ভোলাদাদা বলিলেন,

"ইহারা দেখিতেছি বড় কৃষ্ণভক্ত।"

আমি। কেন?

ভোলাদাদা। "সকলেরই হাতে এক একটী আফিঙের পুঁটলী আছে।" এই সমস্ত দেখিয়া ঐ রাস্তায় যাইতে যাইতে দূরে নীলগিরি পর্ব্বত দেখা গেল। তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে। প্রভাতশিশিরসিক্ত নীলগিরির মূর্ত্তি কি সুন্দর! এমন ঘোর নীলবর্ণ কোন পাহাড়ের দেখি নাই—দূর হইতে এইরূপ বর্ণ দেখায় বলিয়া বোধ হয় এই পর্ব্বতের নাম নীলগিরি হইয়াছে। নীলগিরি দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম—ভোলাদাদা বলিলেন,

'অমৃতবাবু! আঁপনি কিঁ কাণা?'

আমি। কেন?

ভোলাদাদা। দেখিতেছেন না? পঁশ্চিম দিকে ভয়ানক নীল মেঘ উঠিয়াছে এখনই বৃঁষ্টি হইবে—বলিয়া পাহাড়ের দিকে দেখাইলেন—

আমি। ভোলাদাদা! ও ত মেঘ নয়—ওই নীলগিরি—

ভোলাদাদা। বল কি? আহা! পাঁহাড় কি সুন্দর!

আচ্ছা ! শুনেছি পাহাড়ের উপর মানুষ উঠিতে পারে—উহাতে উঠিবার সিঁড়ি আছে নাকি, না মই লাগাইয়া উঠিতে হয় ?

আমি। সিঁড়ি ও নাই—মইও নাই—রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়া উঠা যায়।

ভোলাদাদা। কিঁ চমৎকার ! কি নবজলধরপঁটলসংযোগ !

উভয়েরই নীলগিরি পাহাড় দেখিতে ইচ্ছা হইল—তাই দুই-জনে নীলগিরি অভিমুখে চলিলাম। শ্রীক্ষেত্র যাইবার রাস্তা হইতে নীলগিরি দুই ক্রোশ দূরে। পাহাড়ের ঠিক কোলে নীলগিরি নগর—নগরটী ছোট, নীলগিরি রাজ্যের রাজধানী। এখানে ক্ষত্রিয়বংশীয় হিন্দুরাজা রাজত্ব করেন।

পাহাড়ের ধারেই তিন চারি সারি সুপারি গাছ—তার পর একটী দীর্ঘিকা, পাশে রাস্তা। রাস্তা হইতে সেই দীর্ঘিকা, সুপারি বৃক্ষের শ্রেণী ও বিস্তৃত পর্ব্বতের উন্নত শৃঙ্গগুলি দেখিতে অতি মনোহর।

পাহাড়ের উপর দেখি অতি উচ্চ একখানি মনুষ্যাকৃতি প্রস্তর যেন মাথা ঝুঁকিয়া নীচের দিকে দেখিতেছে। শুনিলাম এই মনুষ্যাকৃতি প্রস্তরের নাম ডুমাইরণা। এখানে প্রবাদ আছে যে ডুমাইরণা পুরাকালে এই পাহাড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণী গর্ভবতী হন। রাজা বড় প্রজাপীড়ক ছিলেন, রাজ্ঞী প্রজাপীড়নে রাজার সহায়তা করিতেন। রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রের নিকট এই কথা জানাইলে ইন্দ্র শাপ দিলেন "রাজা ডুমাইরণা মনুষ্যাকৃতি প্রস্তর হইয়া নীলগিরি পর্ব্বতের মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং যতদিন না সেইখানে সমুদ্র আসিবে ও রাজা সেই সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া রাণীকে খাওয়া-

ইবেন ততদিন রাণী প্রসব বেদনা ভোগ করিবে।” সেই অবধি রাজা ছিপ্ হাতে করিয়া সেইখানে প্রস্তরমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সমুদ্র এখন নীলগিরি হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে। এখানকার লোকের বিশ্বাস সমুদ্র একদিন এই পাহাড়ের নিকট আসিবে, তখন ডুমাইরণা মাছ ধরিয়া রাণীকে খাওয়াইলে উভয়ে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে যাইবেন।

সেই মনুষ্যাকৃতি প্রস্তর দেখিয়া ও প্রবাদ শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য্য হইলাম।

তার পর রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। রাজবাড়ীর ভিতর কেমন অন্তঃপুর হইতে বাহির বাড়ীর কূয়ায় যাইবার মাটীর ভিতরে খিলান করা পথ। একটী বকুল বৃক্ষতল অতি মনোহর —বৃক্ষতলটী উচ্চ ও প্রশস্তরূপে বাঁধান—এখানে বসিয়া চিন্তা করিতে কি সুখ! এ স্থানটী অতি সুশীতল—চারিদিকে নানা-জাতি নবপল্লবিত তরু ও পাহাড় এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

পঞ্চশিবে মিলন।

If I should meet thee
After long years,
How should I greet thee?
With silence and tears

Byron.

ভোলাদাদা শুনিলেন এই নীলগিরি পাহাড়ের উপরে পঞ্চশিব নামে এক মহাদেব আছেন—বড়ই জাগ্রত দেবতা। ভোলাদাদা তাঁহার পূজা না দিয়া কোন মতেই নীলগিরি হইতে ফিরিতে চাহিলেন না।

পূর্ব্বদিকের আকাশ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বেই ভোলাদাদা ও আমি একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া সেই মহাদেব দর্শনে চলিলাম। এই পথপ্রদর্শকটী দেখিতে খাট—কিন্তু তাহার নাম গৌরিশঙ্কর সিংহ বিদ্যাধর হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্ত—যেন শরীরের খর্ব্বতা পূরণ করিবার জন্য তাহার পিতামাতা এই গালভরা নাম রাখিয়াছেন। যাহা হউক গৌরিশঙ্করের (সংক্ষেপে) সমভিব্যাহারে আমরা পঞ্চশিব দেখিতে চলিলাম। তখন পূর্ব্ব আকাশে রংয়ের উপর রং প্রতিফলিত হইতে লাগিল—যেন সেই আকাশরূপ চিত্রপটে কোন চিত্রকর

প্রথমে এক ছবি আঁকিল, আবার তাহা মুছিয়া আর এক বর্ণ ফলাইল – তাহাও যেন পছন্দ না হওয়াতে (কাশীতে মহিমার ছবি আঁকিতে আমার যেমন হইত) আর এক রংয়ের ছবি আঁকিল। প্রকৃতি! তুমিও এত চঞ্চলা কেন? এই যাহা দেখিতেছি তাহা কি তোমাব পছন্দ হয় না—তাই মুছিয়া আর এক ছবি আঁকিতেছ? ক্ষণেকের জন্য ও তুমি স্থির থাক না কেন? আর আমাদেরও স্থির হইতে দাও না। এই পাহাড়ের উপর কোথায় যাইতেছি? কবে স্থির হইব? এ জীবনে নয়—মৃত্যুর পরে? তাহাও জানি না।

যে পাহাড়ে ঐ ঠাকুর আছেন তাহা নীলগিরি নগর হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে। পথে যাইতে যাইতে সূর্য্যোদয় হইল—তাহার এক ঘণ্টা পরে আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অর্দ্ধেক পথে এক করঞ্জবৃক্ষরাজিপূর্ণ স্থানে পৌঁছিলাম—তথায় শিলাখণ্ডের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া জল-স্রোত যাইতেছে। আমরা সেই করঞ্জ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় শৈলখণ্ডে বসিয়া স্ফটিকতুল্য জল পান করিলাম ভোলা-দাদা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন তিনি এস্থানে অন্ততঃ একঘণ্টা না বিশ্রাম করিয়া আর উঠিতে পারেন না—তিনি পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কি হে বাঁপু ক্ষুদ্রনামধারী পুরুষ! সাতজন্ম-যদি তোমার নামটা মুখস্থ কঁরি তবুও তোমার নাম মনে থাঁক্-বার কথা নয়—কিঁ ব’ল্লে বাপু তোমার নাম’—পথপ্রদর্শক বলিল “আস্তর নাম গৌরিশঙ্কর সিংহ বিদ্যাধর হরিচন্দন মহা-পাত্র সামন্ত”—ভোলাদাদা বলিলেন ‘আর খানিকটা ল্যাজ বাড়াইতে পাঁর নাই? সে কঁথা যাউক এখানে বাঁঘের ভয় নাই

ত ?' পথপ্রদর্শক বলিল "সান্ সান্ বাঘ আছন্তিঃ"—ভয়ে ভোলাদাদার মুখ শুকাইয়া গেল দেখিয়া পথপ্রদর্শককে তাঁহার কাছে রাখিয়া আমি একেলা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ক্ষণেক উঠিয়া এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের গাত্রে দেখি এই দুই ছত্র কবিতা লেখা—

ভেবে ছিলাম ভুলিব তোমায়
কিন্তু মন ভুলিতে না চায়——

উড়িষ্যা দেশে এই নীলগিরি পাহাড়ে বৃক্ষের উপর বাঙ্গালায় কে এ কবিতা লিখিল? খুঁজিয়া দেখি আর এক শাখায় লেখা—

কেন ত্যজিনু সংসার ?
তারে যে পাব না আর।

এই দুই ছত্র মধ্যে দুটী লাইন দিয়া কাটা—নিকটে আর এক ডালে লেখা

কেন মাঝে মাঝে এই কথা উঠে মনে
পুনরায় দেখা হবে তাহার সনে ?

চারিদিকে খুঁজিলাম আর লেখা নাই—হৃদয় অস্থির হইল।

পাহাড়ে আরও উঠিতে লাগিলাম। লোকের পদচিহ্নে একটী পথের রেখা আছে, সেই রেখা ধরিয়া আমি উঠিলাম—এক এক স্থানে পথ বড় ভয়ানক—বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া কতকটা উঠিতে হয়। আমি জুতা খুলিয়া লতা ও ছোট গাছ ধরিয়া যাইতে লাগিলাম—যদি একটী গাছ খসিয়া যাইত তথনি সেই উচ্চস্থান হইতে পাহাড়ের নিম্নে পড়িয়া আমার শরীর চূর্ণ হইত। তবু শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতোপরি উঠিলাম। পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া এক অপরূপ স্থানে পৌঁছিলাম—নিশ্চয়ই এইটী তীর্থস্থান

—ওই যে ফুল বিল্বপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ জীবনে আর তেমন রমণীয় স্থান দেখি নাই—সম্মুখে সূর্য্যকিরণে সহস্ররৌপ্যখণ্ডবৎ সমুজ্জ্বলা একটী নির্ঝরিণী—চারিদিকে ছোটবড় পাহাড়ের উপর পাহাড় উঠিয়াছে—জল লাফাইয়া লাফাইয়া জলের মত মধুর গীতি-শব্দের সহিত নিম্নে একটী সরোবরে পড়িতেছে—কত শত অপূর্ব্ব পুষ্পের আঘ্রাণ চারিদিক হইতে আসিতেছে—নানা-জাতীয় পাখীগণ মধুর কণ্ঠধ্বনি করিয়া তাহাদের এবং শ্রোতার জীবন সার্থক করিতেছে—এইটী নিশ্চয়ই তীর্থস্থান। আমি দেখিয়াছি হিন্দুদিগের তীর্থস্থানগুলি প্রায়ই সুন্দর স্থানে প্রতিষ্ঠিত —যেখানে প্রকৃতিদেবীর অপরূপ রূপ, সেইখানেই আমাদের তীর্থ। এমন প্রাকৃতিক শোভার উপাসক আর কে? দেখ পুরুষোত্তমে ও গঙ্গাসাগরে বিশাল সমুদ্রের অপরূপ মূর্ত্তি, মুঙ্গেরে ও চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড উষ্ণপ্রস্রবণ; প্রয়াগে নীলসলিলা যমুনা ও শুভ্রকায়া গঙ্গারমিলন (যাহা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 'বর্ষাকালে সেই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের জলময় শোভা যে না দেখিল তাহার বৃথায় চক্ষু'); বৃন্দাবনে 'তটশালিনী সুন্দর' যমুনা-তীরে কি মধুর কানন! হরিদ্বারে গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত ও ক্ষীণকায়া গঙ্গার কি মোহিনী মূর্ত্তি!—এমন না হইলে কি তীর্থস্থান? আর নির্জ্জন নীলগিরি পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর এই সুদৃশ্য জলপ্রপাত—এমন না হইলে তীর্থ?

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের তীর্থস্থানের মহিমা ভাবিতে লাগিলাম—কিছুক্ষণ পরে জলকল্লোলভেদ করিয়া দূরাগত অতি মধুর গানের মত শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল—মনুষ্য কণ্ঠ না?—যে দিক হইতে এই মধুর ধ্বনি আসিতেছিল সেই

দিকে যাইলাম—একটা গহ্বরের মধ্যে কে ও বাঁশীর মত স্বরে গীতা পাঠ করিতেছে ?

> নকর্তৃত্বং নকর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> নকর্ম্ম ফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
> নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ,
> অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

গহ্বরের বাহির হইতে যিনি গীতা পাঠ করিতেছেন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলাম—কি রূপের মহিমা!—সেই ছাইমাখা দেহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইলাম—দেখিতে দেখিতে সেই মূর্ত্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল—তখন চিনিলাম সে আর কেহ নহে আমার মহিমা!—যদি সহসা সেই নীলগিরি পর্ব্বতশৃঙ্গ আমার সম্মুখে চলিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িত তবে এত আশ্চর্য্য হইতাম না; যদি আমি সশরীরে স্বর্গলোকে উপনীত হইতাম তবে এত আনন্দিত হইতাম না। আশ্চর্য্যে ও আনন্দে আমি স্পন্দহীনপ্রায় হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মুখে কথা আসিল না—চলিবার শক্তিও রহিল না, কিন্তু পড়িয়াও গেলাম না। মহিমার পুরুষের বেশ —সে ধীরে ধীরে যেন নিদ্রিতাবস্থায় আমার দিকে আসিতে লাগিল—তার চক্ষু দুটী পলক না পড়িয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে—সে জাগ্রত না নিদ্রিত? একদৃষ্টে যেন ঘুমের ঘোরে আমার পানে চাহিতে চাহিতে আমার নিকট আসিয়া মহিমা বসিল। আমারও শরীর অতিশ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণে যেরূপ শিথিল হয় সেইরূপ শিথিল হইয়াছিল—আমিও বসিলাম, মহিমা আমার কোলে মাথা দিল। তখন মহিমার মুখ হইতে

চক্ষু উঠাইয়া আপনার মনে ভাবিলাম, "এই শান্তি—প্রেমই শান্তি—জীবনের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেন এতদিন বৃথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম! ইহা থাকিলে জীবন উদ্দেশ্যশূন্য উদ্যমহীন হইবে না—এ আশ্রয় ছাড়িয়া আর জীবনের ভাবনা তরঙ্গে আলোড়িত হইব না—আজ অবধি এই প্রেমই আমার জীবনের অবলম্বন হইল—ইহাই আমার ধর্ম্ম। আমার এই ক্ষুদ্র প্রেম ফুটিয়া ফুটিয়া ছোট ফুল ও পাখী, তীর্থ ও নির্ঝরিণী, সমাজ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হউক"।

জলপ্রপাতের কি মধুর কল্লোল! বনফুলের কি সুমিষ্ট আঘ্রাণ! তীর্থস্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! আর নবীনা এই ষোড়শবর্ষীয়া মহিমার কি সুন্দর মুখ!—

কিন্তু দেখিতে না দেখিতে তখনই আবার মহিমা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি বিস্মিত হইয়া তার দিকে চাহিলাম। এখন দেখি তার আর সে ঘুমের ঘোর নাই—সেই চিরদিন সুকোমল চক্ষু দিয়া এখন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। মহিমা বলিল—

'হায়! আমি কি করিলাম! ভালবাসার বেগে পাবণ্ডের ব্যবহার ভুলিলাম! একবার দেখিয়া এতদিনের তপস্যার ফল হারাইলাম।' (তার পর আমার দিকে চাহিয়া) 'দস্যু! তোর হেমলতাকে লইয়া তৃপ্তি হইল না?'

আমি—কিছুই না বুঝিয়া বিদ্যুতাহতের ন্যায় বসিয়াই মহিমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম—চক্ষের পলক পড়িল না—মহিমা আবার বলিল,

'না—বলিওনা—আমি তোমার চিঠির কথা শুনিয়াছি,

আমাকে আর প্রতারণা করিও না। হায়! তোমার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করি। তারপর আমি ছয় মাস এখানে আসিয়া ঈশ্বরোপাসনায় রত ছিলাম, কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে মনে করিয়া সকল কথাই ভুলিয়া যাইতাম—কত গাছে তোমার উদ্দেশে কত কবিতাই লিখিয়াছি—তাই আজ তোমাকে দেখিয়া আবার ভালবাসিলাম—তোমার পাপের কথা ভুলিয়া তোমাকে স্পর্শ করিলাম—আমার এতদিনের তপস্যা বিফল হইল।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মহিমা বলিতে লাগিল—

'নরাধম! নির্দ্দোষীর মত চুপ করিয়া রহিলি যে? এখনি এস্থান হইতে চলিয়া যা—নচেৎ আমি তোর সম্মুখে এই পার্ব্বতীকুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিব।'

মহিমা আমাকে তিরস্কার করাতে আমার একবার ইচ্ছা হইল আমিই তাহার সম্মুখে পার্ব্বতীকুণ্ডে ঝাঁপ দিই—কিন্তু তাহা না করিয়া বলিলাম—

'আমি চলিয়া যাইতেছি। এ জীবনে মুহূর্ত্তের জন্য তোমা বিনা আর কাহাকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিই নাই—সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া এত কষ্টে দেশে দেশে তোমার অনুসন্ধানে ঘুরিলাম—তাহার এই প্রতিফল তুমি দিলে!'

মহিমা বলিল,

'আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। যে এমন কুকাজ করিতে পারে তাহার মিথ্যা কথা কহা অসম্ভব নয়। কেন আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছ? আমি তোমার সঙ্গে যাইব না—আর তোমার মুখ দেখিতে চাই না—তুমি আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছ—এ যাতনা তুমি বুঝিবে না'—

দ্রুতবেগে মহিমা সেই গহ্বরে প্রবেশ করিল—এবং ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

আমি আর তাহাকে কষ্ট না দিয়া আর একবার (বুঝি জন্মের মত) মহিমার পানে চাহিয়া তথা হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময় বলিলাম,

'মহিমা! কে তোমাকে চিঠি দেখাইয়াছিল জানি না, কিন্তু আমি কামাখ্যাকে কোন চিঠি লিখি নাই। কাশীতে হেমলতার সহিত আমার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এখন সকল কথা ভাবিয়া বোধ হইতেছে কামাখ্যাই হেমলতাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল এবং সেই আমাদের এই বিসম্বাদের কারণ।'

এই বলিয়া ফিরিলাম—সে অবস্থায় পাহাড় হইতে নামিতে পারিব এ আশা ছিল না—তবু ভাবিলাম এস্থান হইতে যাই। কে বলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মন শীতল হয়? সেই পুরাতন জলপ্রপাতের জলকল্লোল—পার্ব্বতীকুণ্ডের স্ফটিক জল—প্রাচীন পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ—নবীনা মহিমার সুন্দর মুখ—সকলি কি সেইরূপ আছে?—সকলই কি হৃদয়স্নিগ্ধকারী? সকলি তখন বিষময় বোধ হইল।

অতি ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে সেই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর গিয়াছি মহিমা দ্রুতবেগে আর এক পথে আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল—তখনও সে কাঁদিতেছে; অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মহিমা বলিল,

"অমৃত! অমৃত! আমাকে ক্ষমা কর। এখন বুঝিতেছি তোমার কথাই ঠিক—তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইও না—

হেমলতা কি বলিয়াছে বল। আমি না বুঝিয়া তোমাকে কত কষ্টই দিয়াছি—কিন্তু আমি তাহার সহস্রগুণ কষ্ট নিজে পাইয়াছি। এখন বুঝিতেছি এ সমস্ত কাম্যখ্যাবাবুরই কাজ—সেই ত চিঠির কথা বলিয়াছিল। হায়! এতদিন তাহা বুঝি নাই কেন? তাহা হইলে গৃহত্যাগ করিতাম না, এত অসীম কষ্ট পাইতাম না। এত দোষের কি ক্ষমা আছে? অমৃত! তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে ক্ষমা কর।”

চতুর্থ অধ্যায়।

মরণে কি সুখ!

> “এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে,
> কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পূরাইবে।”
>
> বঙ্কিমচন্দ্র।

মহিমা আমার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—আমি বলিলাম—‘মহিমা! উঠ—আমি তোমায় ক্ষমা করিব কি? আমি যদি তোমাদের ছাড়িয়া কাশীতে না যাইতাম তাহা হইলে এত দুর্ঘটনা হইত না—তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ ত? সে কথায় কাজ নাই—এখন বেশ্ বুঝিলাম তোমার মত ভালবাসা জগতে বিরল—ইহা না বুঝিয়া এত কষ্ট

পাইলাম—এখন বল কিরূপে তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছিলে—এবং কামাখ্যাই বা কোথায়?'

মহিমা শিহরিয়া উঠিল এবং বলিল 'এখন সে কথা থাক্—পূর্ব্বকথা আর একদিন শুনিবে—এখন তুমি বল—একেলা এখানে কিরূপে আসিলে?'—

আমি তখন সংক্ষেপে কোথায় কোথায় তাহাদের অনুসন্ধান করিয়াছি তাহা বলিলাম। মহিমা বলিল,

'ঈশ্বরের ইচ্ছায় এতদিন পরে তোমার সহিত দেখা হইল—কিন্তু আমি আর মনুনগরে যাইব না। আমি যে তীর্থ স্থানে দিন কাটাইয়াছি তাহা অনেকে বিশ্বাস করিবে না—আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ হয়ত সেই কথা তুলিয়া কোন দিন আমাকে ভৎসনা করিবে—স্ত্রীলোকে অনেক সহ্য করিতে পারে কিন্তু সেরূপ ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারে না—মরণের পূর্ব্বে তোমার দেখা পাইলাম, এখন আমার সকল আশা মিটিয়াছে—এখন আমি ঐ পার্ব্বতীকুণ্ডে যাইয়া ডুবিয়া মরি।—অমৃত! তুমি গৃহে ফিরে যাও—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে মহিমা কোথায়? তাকে বলিও—'যেখানে সমাজের অত্যাচার নাই, যেখানে ভালবাসায় বিঘ্ন নাই, যেখানে মিলনের পর বিচ্ছেদ নাই, যেখানে শান্তির পর শোক নাই, সেই খানে মহিমা গিয়াছে'—

আমি। তুমি সঙ্গে না থাকিলে আমারও বাঁচিতে সাধ নাই। অন্তর্যামী হরি জানেন তোমাকে হারাইয়া যেন জীবন হারাইয়াছিলাম—কলের পুতুলের মত খাইতে হয় খাইতাম—ঘুমাইতে হয় ঘুমাইতাম—কিছুতেই আগ্রহ ছিল না—জীবন উদ্দেশ্যহীন হইয়াছিল—পশুতে আমাতে প্রভেদ ছিল না। সে অবস্থায় আর

ফিরিয়া যাইতে চাই না, তুমি যদি মন্নুনগরে না যাইতে চাও—তবে এস তুজনে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া পার্ব্বতীকুণ্ডের শীতলজলে এ পার্থিব জীবন শেষ করি। মহিমা মনে পড়ে কি তুমি বাল্যকালে একটী কবিতায় লিখিয়াছিলে 'আবার মিলিব মোরা মরণের পরে'—সে কথাটী ঠিক। আমি অনেক কথা অবিশ্বাস করিয়াছি একথা কখন অবিশ্বাস করি নাই যে মরণের পর জীবন আছে।

মহিমা। এস মরিবার পূর্ব্বে তুজনে মনের কথা বলি—অমৃত! মনে পড়ে কি সেই দিন যবে তুমি প্রথম মন্নুনগর হইতে কলিকাতা যাও—এবং আমার সহিত সাধিয়া ভাব করিয়াছিলে—কে জানিত সেই আড়ি ও ভাব চিরজীবন থাকিবে। বাল্য প্রণয়ের মত স্থায়ীভাব মানুষের আর কিছুই নাই—

আমি। মহিমা! তার পরে মনে পড়ে কি একদিন আমি গঙ্গাজল হাতে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছিলাম তোমা ভিন্ন আর কাহাকে ভালবাসিব না—আকাশে ভয়ানক চীৎকার করিয়া পেচক ডাকিয়াছিল—তুমি ভীতা হইয়া আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে বারণ করিয়াছিলে—কিন্তু আমি শুনিলাম না; সেই এক সুখের দিন—আর আজ আর একদিন—

মহিমা। এই সুখের পর আর তুঃখ না জানিয়া মরণে কি সুখ!—এস তুইজনেই একসঙ্গে ডুবিব!

কথা কহিতে কহিতে তুই জনে সেই পার্ব্বতীকুণ্ডের নিকট আসিয়াছিলাম—এবং হাত ধরাধরি করিয়া প্রাণপাত করিবার জন্য জলে নামিতেছি—এমন সময়ে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর হইতে কে ডাকিল

"অমৃত! মহিমা!"

দুই জনে সশঙ্কে ফিরিয়া দেখি ভোলাদাদা ও পথপ্রদর্শক আসিয়া শৃঙ্গের উপর পৌছিয়াছে—

সে দৃশ্য সুদক্ষ চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য। দুই পাশে পর্ব্বত—এক পর্ব্বত উপরে ভোলাদাদা ও পথপ্রদর্শক। নিম্নদেশে কটি অবধি জলে দাঁড়াইয়া আমি ও মহিমা—সম্মুখে পার্ব্বতী-কুণ্ড—পার্শ্বে জলপ্রপাতের জল লাফাইয়া লাফাইয়া পার্ব্বতী-কুণ্ডে পড়িতেছে। যে চারিজন মনুষ্য তথায় আছে তাহাদের অন্তরের ভাব কিরূপ! ভোলাদাদার সে দৃশ্য ও মহিমাকে দেখিয়া শিশুর মত আনন্দ—পথপ্রদর্শকের ব্যাপার না বুঝিয়া স্তম্ভিত ভাব—মহিমার ও আমার সুখের মরণে কিরূপ বিঘ্ন! যদি সুদক্ষ চিত্রকর হইতাম তবে এই ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য চিত্রপটে তুলিয়া চিরস্থায়ী করিয়া সে চিত্র সম্মুখে রাখিতাম, এবং নিত্য আমার জীবনের এক অমূল্য ঘটনার চিত্র নিরীক্ষণ করিতাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০০—

বাবাজী।

"সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে,
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে।
বনিবাসিনী আমি বাকল বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

পর্ব্বতশৃঙ্গে ভোলাদাদা ও পথপ্রদর্শক সে সময় উপস্থিত হওয়াতে আমাদের এক সঙ্গে হাতধরাধরি করিয়া ডুবিয়া মরিবার সাধে বঞ্চিত হইতে হইল। আমরা উঠিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলে ভোলাদাদা বলিলেন

"কিঁ মহিমা! তুঁই কোঁথা থেঁকে এঁলি? অমৃতবাবু! এঁই কিঁ মহাদেবের স্থান? মন্দির কোঁথায়? পঞ্চ শিবই বাঁ কোঁথায়?"

মহিমা। এ মহাদেব মন্দিরে থাকেন না। এই পর্ব্বতশৃঙ্গই তাঁহার মন্দির—এই জলপ্রপাত তাঁহার আসন—ঐ সুনীল আকাশ তাঁহার চন্দ্রাতপ—পক্ষিগণের মধুর কূজন তাঁহার শঙ্খ-ধ্বনি—জলের কল্লোল তাঁহার বেদপাঠ—আর মনুষ্যের ভক্তি তাঁহার নৈবিদ্য—

ভোলাদাদা। আমি মহাদেব মূর্ত্তি দেখিব—

তখন পথপ্রদর্শক উপরের ক্ষীণ জলস্রোত বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল—জল বন্ধ হইলে সেই পাহাড়ের উপর কি অপূর্ব্ব-শোভা দেখিলাম! -সারি সারি পাঁচটী মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা দিল—কি সুন্দর! ভোলাদাদা নমস্কার করিলেন, আমিও নমস্কার করিলাম—তাপিত হৃদয়ে সুন্দর ভক্তিরসের উদয় হইল।

তার পর পথপ্রদর্শক আবার উপরের জল ছাড়িয়া দিল—সে জল তখন মহাদেবের মাথার উপর দিয়া বহিতে লাগিল।

ভোলাদাদা বলিলেন

"এমনতীর্থস্থান আর দেখি নাই—কিন্তু মহিমা তুমি খুঁকুযবেশে কেন?"

মহিমা। আমি এই খানেই বাস করিয়াছি—লোকে আমাকে 'বাবাজী' বলিয়া জানে। যাহারা মহাদেবের পূজা করিতে আসে তাঁহারা স্বেচ্ছায় আমাকে খাবার দ্রব্য আনিয়া দেয়। যেদিন তাহা না পাই বন হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া আমি ও আমার তরু নামে হরিণটী তাহার দ্বারা জীবনধারণ করি। প্রাতে উঠিয়া তরু বনে বনে বিচরণ করিয়া বেড়ায়—আমি তখন এক মনে ভগবদ্গীতা পাঠ করি—সমস্ত কণ্ঠস্থ হইয়াছে তথাপি তাহাই পড়িতাম—অন্য পুস্তক আমার নাই—থাকিলেও পড়িতাম না। গীতা কি মধুর! যত পাঠ করি ততই প্রাণ শীতল হয়। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ও অপরাহ্নে তরুর গাত্র ধৌত করিয়া দিই—যদি কোনদিন কাঁটা ফুটিয়া তরুর গায়ে রক্ত পড়িয়াছে সে দিন যে কত কাঁদিতাম তাহা বলিতে পারি না। মানুষ মায়া ত্যাগ করিতে পারে না—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া মমতা ত্যাগ করিতে

পারি নাই। যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন মমতাহীন হইতে কেহ পারে না—আমরা ত নয়ই। এই বিজন বনে থাকিয়া কত দিন ঈশ্বর চিন্তায় কাটাইলাম কিন্তু ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে মনে হইত "আমি সংসারের কোন উপকার করিলাম না ত। এর চেয়ে যদি সংসারে থাকিয়া এক দিনের জন্য সেবার দ্বারা এক জনের কষ্ট লাঘব করিতে পারিতাম তবে জীবন সার্থক হইত—ইহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম।" কিন্তু সমাজ কি আমাকে গ্রহণ করিবে?

আমি। সমাজ আর কে?—মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র—তবে কেন যাহা যুক্তিসিদ্ধ তাহা সমাজ করিবে না।

ভোলাদাদা। মহি কি বল্‌চে? ও যদি বাড়ী না ফেঁরে আমিও আর ফিঁর্‌বনা।

অনেক কথাবার্ত্তার পর মহিমা মন্নুনগরে ফিরিতে সম্মত হইল। মধ্যাহ্নে সেই স্থানে আহার করিয়া (ভোলাদাদা আহ্লাদে ও ক্ষুধায় একহাঁড়ি মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি একেলা খাইলেন) সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া বালেশ্বরাভিমুখে চলিলাম। তরু ও আমাদের সঙ্গে আসিল। পাহাড় হইতে নামিয়া বোধ হইল যেন কবিতাময় জীবন ফুরাইল—আবার সেই পথের ধূলা, সংসারের কোলাহল ও পুরাতন পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু সে কথা আর এক অধ্যায়ে বলিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—oo—

ভোলাচটী।

Falstaff—If to be old and merry be a sin then many an host that I know is damned : if to be fat be to be hated then Pharaoh's lean kine are to be loved.

Shakespeares' King Henry IV.

নীলগিরি পাহাড় হইতে বালেশ্বর আসিতে পথে "ভোলাচটী" নামে একটী বাজার আছে ; সে বাজারের নাম কেন ভোলা-চটী হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে সন্ধ্যার সময় ভোলাদাদা, আমি, মহিমা (তখনও 'বাবাজী' বেশে) ও হরিণশাবক তরু এক চটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভোলাদাদা পূর্ব্বে কখনও বাড়ীর বাহির হন নাই—"চটী" শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,

"চটী কি ? ঠনঠনিয়ার যে অল্পমূল্যে অত্যন্ত সুখদ উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ সুন্দর অর্দ্ধপাদুকা পাওয়া যায়— যাহার সৃষ্টি না হইলে সুধু ব্রাহ্মণপণ্ডিত কেন সমগ্র বঙ্গবাসীর জীবন অতি অশান্তি-পূর্ণ হইত সেই চটী কি ?"

আমি। সে চটী নহে—বাজারকে এখানে চটী বলে—

ভোলাদাদা। তা আমি জানি—আচ্ছা বাজারকে চটী বলে কেন?

আমি। তীর্থযাত্রীগণ এই সব বাজারে আসিয়া আহারাদির এত অসুবিধা পায় যে সকলেই চটিয়া যায়—সেই জন্য ইহার নাম 'চটী' হইয়াছে।

ভোলাদাদা আমার হাত টানিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিলেন এবং বলিলেন,

"সার্থক লেখা পড়া শিখিয়াছিলে। ইংরাজি না পড়্‌লে বুদ্ধি খোলে না—আমাদের দেশের লোকে ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে না বলিয়া তাঁহাদের এত দুর্গতি—আমি মনুনগরে ফিরিয়া যাইয়া এবিষয়ে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিব এবং মানবজাতিকে জ্ঞানের সোপানে অন্ততঃ দুই শত পদ অগ্রসর করাইব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমরা 'চটী'র সম্মুখে পৌঁছিলাম—শুনিলাম তথায় দুইজন দোকানদার আছে, উহারা যাত্রীদিগকে নিজের দোকানে লইয়া যাইবার জন্য বড় কলহ করে—রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই জনের ১০।১২ খানি ঘর।

দেখিতে দেখিতে ঐ দুইজন উড়িয়া দোকানদার (আহ্লাদ পাণ্ডা ও প্রহ্লাদপাণ্ডা) আসিয়া ভোলাদাদার দুই হাত ধরিল এবং 'মনিমা! আম্ভর দোকানকু আসন্তু' বলিয়া দুইজনে দুই দিকে টানিতে আরম্ভ করিল।

ভোলাদাদা বলিলেন, "আরে জ্বালাতন কর্‌লে যে—হাত ভেঙ্গে যাবে—যে কম পয়সা নেবে তার দোকানে যাব।"

তখন আহ্লাদ পাণ্ডা বলিল,

"পয়সা কিস হেব? মু পয়সা ন নিমি।"

প্রহ্লাদও বলিল,

"মুবি পয়সা ন নিমি।" বলিয়া পুনরায় দুইজনে দুইদিকে টানিতে লাগিল। আমি হাসিব না কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ভোলাদাদা পকেট হইতে চসমা বাহির করিয়া চক্ষে পরিলেন ও গম্ভীর হইলেন, তবু পাণ্ডারা ছাড়িল না। মহিমা বলিল, "তোমরা কর কি? একজন দাদাকে ছাড়।"

আহ্লাদ পাণ্ডা তখন বলিল, 'ছোয়া বাবাজী কিস কহন্তি? আম্ভর দোকানকু আসন্তু।'

ভোলাদাদা দেখিলেন কিছুতেই তাহারা ছাড়ে না—(যাহারা ভোলাদাকে বুদ্ধিহীন মনে করিয়া থাকেন তাহারা এই স্থানে মনোযোগী হউন) এবং কিঞ্চিত ভাবিয়া বলিলেন,

"যে আগে আমার হাত ছাড়িবে তার দোঁকানে যাব।"

আহ্লাদ পাণ্ডা এই কথা শুনিয়া ভোলাদাদার হাত ছাড়িয়া দিল। তখন প্রহ্লাদ পাণ্ডা ভোলাদাদাকে লইয়া এক দৌড়ে তাহার দোকানে প্রবেশ করিল—আমরাও সকলে সেই দোকানে গেলাম।

বাজার শুদ্ধ লোকে তামাসা দেখিতে সমবেত হইয়াছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহারা আহ্লাদ পাণ্ডাকে 'বোকা দোকানদার।' 'কাঁইকি ছোড়িলি!' বলিয়া তামাসা করিতে লাগিল এবং ভোলাদাদার বুদ্ধির অসীম প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই ঘটনা সকলে জানিলে আহ্লাদ পাণ্ডা বড় নিরাহ্লাদ

হইলেন, এবং অবশেষে লজ্জায় সে বাজারের দোকান বন্ধ করিলেন। প্রহ্লাদ পাণ্ডার সমস্ত বাজার একচেটীয়া হইল—সে আনন্দে ভোলাদাদার স্মরণার্থ এই চটীর নাম 'ভোলাচটী' দিল।

ইহার পর ভোলাদাদাকে কেহ তুচ্ছ করিলে তিনি বলিতেন, "আরে যাও। বড় লোক না হইলে কীর্ত্তি থাকে না। দেখ আমার নামে এক সুবিখ্যাত বাজার হইয়াছে। উড়িষ্যায় গিয়া দেখ—না যাইতে পার উড়িষ্যার মানচিত্রে দেখ 'ভোঁলা-চটী' নামে এক প্রকাণ্ড বাজার হইয়াছে। যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়া থাকে তাহারা সকলেই আমার নামের মহিমা শ্রবণ করে।"

সপ্তম অধ্যায়।

ভোলাদাদার কবিতা।

"Great are the sea and the heaven
Yet greater is my heart".

Heine (Translated).

রাত্রে সেই চটীতে থাকিয়া পরদিবস প্রাতে আমরা বালেশ্বরে আসিয়া পুনরায় "চঞ্চলা" জাহাজে উঠিলাম—পুনরায়

"চঞ্চলা" মন্থরগমনে খালের ভিতর দিয়া সম্মুখের জল কাটিয়া ও পিছনের জল টানিয়া চলিতে লাগিল—তটস্থ কুম্ভীর জাহাজের শব্দ পাইয়া বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল—গাভীগণ আনন্দে জাহাজের সঙ্গে ছুটিতে লাগিল—বালকগণও গাভীর সঙ্গে খালের উচ্চতটের উপর ছুটিতে লাগিল। যাত্রীদের মধ্যে কোন কোন দয়ালু ব্যক্তি বালকদিগকে অধিক দূর দৌড় করাইয়া কষ্ট দিবার জন্য জাহাজ হইতে পয়সা কমলালেবু প্রভৃতি ছুড়িতে লাগিল—তাহা কুড়াইতে গিয়া বালকেরা পরস্পর কলহ ও ঘুষা-ঘুসি করিতে লাগিল—যাত্রীগণের কি আনন্দ! পুনরায় কালীঝুলমাথা নীলপায়জামাপরা বাঙ্গাল খালাসীগণ সুমধুর সুরে 'পানি একবাম', 'যমুনা পিছেল্' প্রভৃতি বোল আওড়াইতে লাগিল, এবং কিরূপে হিন্দুস্থানী যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায় করিবে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীগণ স্থানাভাবে হাত পা না নাড়িয়া গুড়ের মটকীর মত বসিয়া আছে—কেহ হয়ত সুখের পরাকাষ্ঠা হওয়াতে ভৈরবী রাগিণীতে গান ধরিয়াছে—সুশিক্ষিত জনকয়েক বাঙ্গালী বাবু হিন্দুস্থানী রমণীদের রূপের ও গুণের প্রশংসা করিয়া 'এস্থেটিক কল্চর্' করিতেছেন। চিল যেমন একমনে ভাগাড়ের উপর উড়িয়া বেড়ায়, টিকিটমাষ্টার বাবুটী অনন্যলক্ষ্য হইয়া তেমনই কাহার টিকিট নাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন এবং টিকিটহীন যাত্রী পাইলে তাহাকে ফৌজ-দারী আসামীর মত ব্যবহার করিয়া নিজের পকেট পয়সার ভারে ভারি করিতেছেন। ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজিল—একটা ষ্টেসনে জাহাজ থামিল—যাত্রীদের ভরসা হইল এইবার হয়ত

জনকয়েক লোক নামিয়া যাইবে এবং ভিড় কমিবে। ৩ জন নামিয়া গেল—কিন্তু ১৩ জন উঠিল—প্রথমে তাঁহারা আসিয়া নিজে দাঁড়াইলেন তার পর হাতাহাতী করিয়া ৭।৮টী মোট রাখিলেন—শেষে ভোলাদাদার ভুঁড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! কয়টা লোকের ভাড়া দিয়াছেন?'

ভোলা দাদা। কেন?

যাত্রী। ষ্টীমার ও রেলওয়ে কোম্পানির মানুষ ওজন করিয়া ভাড়া লওয়া উচিত।

সৌভাগ্যের বিষয় ভোলাদাদা এ তামাসা বুঝিলেন না—বরং বলিলেন, 'মহাশয়! ঠিক বলিয়াছেন।'

পরদিবস প্রাতে আমরা সুবর্ণরেখা নদীতে পৌঁছিলাম—সুবর্ণরেখা দেখিতে কি সুন্দর! যথার্থই যেন সুবর্ণ রেখা! কেমন অনতিপ্রশস্ত অনতিক্ষুদ্র নির্ম্মলসলিলা নদীটি! অতি প্রত্যুষে সুবর্ণরেখায় পৌছিলাম। তখন নদীতে জল অল্প—ভাটা হইয়াছে—পূর্ণ জোয়ার না হইলে জাহাজ চলিবে না। জাহাজের নোঙ্গর পড়িল—মহিমা জাহাজেই রহিল—ভোলাদাদা ও আমি নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম।

আমার অভ্যাস প্রত্যহ অন্ততঃ চারি ক্রোশ না বেড়াইলে শরীরের জড়তা যায় না ও ক্ষুধা হয় না—ইহাই আমার কডলিবর অয়েল, ইহাই আমার ক্ষুধাসঞ্চারিণী বটিকা। ভোলাদাদা তামাসা করিয়া বলিতেন 'তোমার পেঁশাদারি বেড়ান—ভদ্রলোকের ছেঁলের অত বেড়ান দঁরকার কি? কাঁয়ক্লেশে বিছানা হইতে উঠিয়া স্নানাহার কঁরিতে পারিলেই হইল—লোকে খোঁড়া না বঁলে।' কিন্তু আমার কেমন অভ্যাস, না

বেড়াইয়া থাকিতে পারি না; মাতাল যেমন মদের দোকান দেখিলে যেন কি আকর্ষণে দোকানে প্রবেশ করে তেমনি নদী-তীরে রাস্তা কি খোলা মাঠ দেখিলে আমার প্রাণ চায় কেবল ঘুরিয়া বেড়াই। তাই ভোলাদাদাকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণরেখা তীরে সমুদ্রাভিমুখে চলিলাম।

প্রায় তিনি ক্রোশ গিয়া সমুদ্রের হু হু শব্দ শুনিলাম—তখন আরও কৌতূহল বাড়িল—আরও কিয়দ্দূর যাইয়া দুইজনে সমুদ্র তীরে পৌঁছিলাম। তথায় বালুকাময় বেলাভূমির উপর ছেলে-মানুষের মত ভোলাদাদা ও আমি ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম—কখনও রক্তবর্ণ কর্কট ধরিতে যাই—তাহারা ক্ষিপ্রবেগে সেই বালির ভিতর প্রবেশ করে—আমরা ছুটিয়াও একটা ধরিতে পারি না; কখনও নানারকমের শঙ্খ ঝিনুক ও কড়ি কুড়াই—কাপড়ে যত ধরে তত লইলাম তবু আশা মিটিল না। কখনও বালুকাস্তূপের উপর উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি—দেখি সম্মুখে পবনে বালুকারাশি উড়াইয়া নূতন বালুকাস্তূপ গড়িতেছে—বেলাভূমির পর সাগরের তরঙ্গ নাচিতেছে—রবির কিরণে তরঙ্গে তরঙ্গে সহস্র মাণিক জ্বালাইয়াছে—দূরে সমুদ্রের নীল জল স্থির হইয়া আছে—আরও দূরে জল আরও নীল; শেষে কেমন অনন্ত আকাশ ও সমুদ্র মিশিয়াছে! এখানে দাঁড়াইয়া এ সব দেখিয়া কে না আত্মহারা হয়? কে না ভাবে 'এই অনন্তের আমি এক কণা মাত্র—একটী কীটানুকীট—তথাপি আমার পক্ষে আমার জীবনের মত আর কিছুই নাই। আমার প্রাণ আছে—আমি অনন্তে মিশিবার পূর্ব্বে এই প্রাণ জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা সার্থক করিব?'

ভোলাদাদা কত কথাই বলিলেন। একবার বলি-লেন 'উঃ এঁত জল! সেই যে স্কুলে পড়েছিলাম পৃথিবীর তিঁন ভাগ জল এঁক ভাগ স্থল (যাহা এতদিন ভূগোল লেখকগণ রঁহস্য লিখিয়াছে মনে করিতাম) তাহাই ত দেখিতেছি ঠিঁক। তিন ভাগ কেন ৯৯ ভাগ জঁল বল্‌লেও এখন বিশ্বাস করি'—আবার বলিলেন,

'আচ্ছা! বর্ষাকালে সমুদ্রের জঁল উথলিয়া সমস্ত পৃথিবী ডুঁবাইতে পারে ত?'

আমি বলিলাম 'সামান্য বর্ষার জলে এ অগাধ জলধির কোন পরিবর্ত্তন হয় না—বর্ষাকালেও সমুদ্রের জল এই অবস্থায়ই থাকে।'

ভোলাদাদা বলিলেন "কি নবজলধর পটলসংযোগ!"

সমুদ্র দেখিয়া ভোলাদাদার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল—তিনি বলিলেন,

"সমুদ্র দেখিয়া কেঁমন আমার মনে কবিতার তরঙ্গ উঠিতেছে শুনিবেন?

সমুদ্র কহিছে কথা,
বায়ুর ধরেছে মাথা।
বায়ু যায় ধীরে চ'লে,
সমুদ্র যায় দুলে দুলে॥

অমৃতবাবু! তুমিও মঁনে কর্‌লে সুন্দর কবিতা লিখ্‌তে পার। লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে 'চাঁদের হাসি', 'নবীন শশী', এই রকম কঁচি কঁচি মিষ্টি মিষ্টি কথা দিতে হয়—"

আমি দেখিলাম ভোলাদাদা কবিত্বে এত উন্মত্ত যে জাহাজ ছাড়িয়া দেয়—শেষে তাঁহার হাত ধরিয়া সেই সমুদ্রতীর হইতে ফিরিলাম। জাহাজে আর দুই দিন থাকিয়া কলিকাতায় পোঁছিলাম—দূর হইতে মনুমেণ্ট দেখিয়া ভোলাদাদা আহ্লাদে লাফাইতে লাগিলেন—ক্রমে উলুবেড়িয়া, আকড়ার ইটের কারখানা, নবাবের বাড়ী, বোটানিকাল গার্ডেন, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, খিদিরপুরের ডক্, হাইকোর্ট, স্নানাগার, একে একে অতিক্রম করিয়া 'চঞ্চলা' আসিয়া ঘাটে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই দিনই কলিকাতা হইতে নৌকা করিয়া ভোলাদাদা, আমি ও মহিমা মনুনগরে আসিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

দলাদলি।

"The Blues lost no opportunity of opposing the Buffs, and the Buffs lost no opportunity of opposing the Blues."

Pickwick Papers.

আজ তিন দিন হইল আমরা মনুনগরে ফিরিয়া আসিয়াছি। মহিমা সুষমার কাছে এবং ভোলাদাদা তাঁহার বাড়ীতে

আছেন। এই তিনদিনের মধ্যে গ্রামে ভয়ানক বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এবং তদুত্থিত ধূমে লোকের মন অন্ধকারে আবৃত করিয়াছে।

যাঁহারা বলেন বাঙ্গালী নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য, আমার ইচ্ছা করে তাহাদের একবার দলাদলির সময় পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখাই। যেমন তরঙ্গ বিনা সমুদ্র শোভা পায় না, যেমন মেঘ বিনা আকাশ শোভা পায় না, যেমন টৌর্ণি মোক্তার ভিন্ন আদালতের শোভা হয় না—তেমনই দলাদলি বিনা পল্লীগ্রামের শোভা হয় না। মিষ্টতাহীন সন্দেশ যেমন অপদার্থ, লোভহীন ব্রাহ্মণ যেমন অপদার্থ, মিথ্যাকথাশূন্য উকীল যেমন অপদার্থ, দলাদলিশূন্য পল্লীগ্রাম তেমনই অপদার্থ। দুর্ভিক্ষ হইলে অনেক চাউলের মহাজনের মন যেরূপ হয়, দেশের অর্দ্ধেক লোকের পীড়া হইলে কোন কোন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার-দের মনে যে ভাব হয়, বড়মানুষদের ঘরে মোকদ্দমা বাঁধিলে মুদ্রালোলুপ বারিষ্টারদের মনে যে ভাব হয়, আতপ চাউল দেখিলে ভেড়ার মুখে যে ভাব হয়—দলাদলির সূত্রপাত হইলে পল্লীগ্রামে চাঁইদের মনেও সেই ভাব হইয়া থাকে।

আমাদের গ্রামে যে দলাদলি হইল তাহার কারণ এই। পূর্ব্বে লিখিয়াছি জাহাজে কলিকাতা অবধি আসিয়া তথা হইতে এক নৌকা লইয়া আমরা মনুনগরে আসি। আমাদের পানসী যখন মনুনগরের ঘাটে লাগিল তখন সেই ঘাটে কয়েক জন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল—আমরা আসিতেছি দেখিয়া অনেকেই ছুটিয়া নৌকায় কে কে আছে দেখিতে লাগিল। একজন স্ত্রীলোক মাটীর শিব গড়িতেছিল—নৌকা ঘাটে লাগিতে

হস্তস্থিত মাটী জলে ফেলিয়া নৌকার কাছে ছুটিয়া আসিল, আর একজন বামহস্তে নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গঙ্গাজল ছিটাইয়া মাথায় দিতেছিল—নৌকা দেখিয়া সেও ছুটিয়া আসিল কিন্তু অন্যমনস্কে (অথবা ব্রতভঙ্গ হইবার ভয়ে) বামহস্তে নাসিকা টিপিয়াই একদৃষ্টে আমাদের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; আর এক রমণী জলের ঘড়া উল্টাইয়া গঙ্গা-জলে সাঁতার শিখিতেছিল—নৌকা দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ঘড়াটী তার হেলিয়া দুলিয়া জোয়ারের জলে ভাসিয়া গেল; সেদিকে না লক্ষ্য করিয়া রমণী নৌকার মধ্যে কে আছে তাই একমনে দেখিতে লাগিল। দেখিবার কথাই ত—যে মহিমা আজ দুই বৎসর হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছিল সে নৌকা করিয়া কোথা হইতে আসিল? নৌকা হইতে নামিয়া মহিমা সেই ঘাটে সমবেত রমণীগণের নিকটে যাইতেছে, তাহারাও হাসিয়া কথা কহিতে আসিতেছে—এমন সময় ভোলাদাদা আহ্লাদিত মুখে চাটুর্য্যেদের বড়বৌকে (যিনি নাক টিপিয়া ছিলেন) বলিলেন,

'কিঁ ধোপা বৌ? ভাঁল আছিস্ ত?' সর্ব্বনাশ! বামুনের মেয়েকে ধোপা বৌ বলা? ভোলাদাদা ক'রলে কি? ঐ কথা শুনিয়া চাটুর্য্যেদের বড় বৌ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,

'পোড়ারমুখো বিট্‌লে বামুন! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! এত লোকের সাম্‌নে আমাকে ধোপা বল্‌লি? তোর বোণটাকে কোথা থেকে ধ'রে নিয়ে এসে আমাকে বাপান্ত ক'রলি! এর ফল পাবি।'

আমি বলিলাম 'বড় বৌ! ভোলাদাদাকে ত জান—তিনি ভুলিয়া কি বলিয়াছেন!'

বড় বৌ। তোমার আর শাউখুড়ি ক'রতে হবে না—ও মিন্‌সে জানে না আমার তিনি বাচস্পতি ঠাকুর—গ্রামের মাথা? জাতবিচের সব্ উঠে গেছে নাকি? যে মেয়ে ঘর থেকে চ'লে গেল তাকে আবার ঘরে আনা? যাই— সবাইকে বলিগে—

রাগে গর্ গর্ করিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া চাড়ুর্য্যেদের বড় বৌ চলিয়া গেল। আমরা পাছে পাছে চলিলাম—আমাদের দেখিয়া অন্য স্ত্রীলোকেরা সরিয়া দাঁড়াইল —যেন আমাদের জাতিপাত হইয়াছে।

বাচস্পতি ঠাকুর ও শিরোমণি মহাশয় দুটী ভাই। শিরোমণি মহাশয় বিদ্যার জাহাজ বলিলে হয়—এমন সংস্কৃত পুস্তক প্রায় দেখিতে পাই না যাহা তিনি পড়েন নাই, আর একালের ছেলেদের মত পাত উল্টে পড়া নয় সকল পুস্তকই তাঁহার কণ্ঠস্থ কিন্তু, অন্যান্য ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের মত, বিষয়বুদ্ধি না থাকাতে তাঁহার বিদ্যা অর্থকরী হয় নাই।

বাচস্পতি মহাশয়ের স্বভাব রুক্ষ—মুগ্ধবোধের অতি কঠিন তৃতীয় সূত্রটি মুখস্থ করিয়া তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি আর ব্যাকরণ হাতে করেন নাই—কাব্যের মধ্যেও যাহা পড়িতেন তাহাই ভুল বলিয়া বোধ হইত। কাজেই ইদানীং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া তাসখেলা, মাছধরা প্রভৃতি সৎকার্য্যে সময়াতিপাত করিতেন। এমন তাসখেলার বাই আর কাহারও দেখি নাই—একখানা ছক্কা কিম্বা পঞ্জা জিতিলে

তিনি দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া মাথায় দিয়া এবং বামহস্ত কোমরে দিয়া অন্ততঃ একঘণ্টা নৃত্য করিতেন।

গঙ্গার ঘাট হইতে বড় বৌ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে রাগে ঘড়াটা মাটীতে ফেলিয়া (গঙ্গার ঘাটে কিম্বা পথে কেন ফেলেন নাই তাহা বলিতে পারি না) রকের উপর কপালে হাত দিয়া বসিলেন, এবং তাহার পুত্র নীলুকে ডাকিয়া বলিলেন 'নীলু তোর বাচস্পতি ঠাকুরকে ডাক্‌তো ?'

নীলমণি চট্টোপাধ্যায় (ছোট বাচস্পতি ঠাকুর) তখন 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া সেই ব্যাঘ্রকে আন্তরিক গালাগালি দিতেছিল এবং যিনি লেখাপড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উদ্দেশেও নানা কথা বলিতেছিল—কারণ তাহার মন তখন তাহাদের আম-বাগানের কচি আমের ভিতর—কিন্তু পিতার ভয়ে ব'ই নিয়া না বসিলে নয় কাজেই মিনিটে দুই বার হাই তুলিতে তুলিতে 'কথামালা' পড়িতেছিলেন। মাতার কথা শুনিয়া নীলমণি বড় বাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশে দৌড়িলেন—

ঘোষেদের বৈঠকখানাঘরে বাচস্পতি মহাশয় তাস খেলায় এক বোম্ জিতিয়া পূর্ব্বকথিতরূপে নৃত্য করিতেছিলেন—হঠাৎ নীলমণি যাইয়া বলিল,

'বাবা! মা তোমায় ডাক্‌চে'—

বাচস্পতির নৃত্য থামিল, মুখ শুকাইল, বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চাহিয়া জুজু হইয়া ভয়ে ভয়ে তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। —বাচস্পতি ঠাকুরের মেজাজ রুক্ষ হইলেও ব্রাহ্মণী তাহাকে পদনখপ্রান্তে রাখিয়াছিল।

নীলমণি তথা হইতে ছুটিয়া তাহাদের আমবাগানে গিয়া কাঁচা আম পাড়িল এবং লবণ ও লঙ্কা মিশাইয়া আরও দু তিনটি বালকের সঙ্গে আমোদ করিয়া অমৃততুল্য সেই আমচুর খাইতে লাগিল।

এদিকে বাচস্পতি ঠাকুর বাড়ী ফিরিয়া গিয়া বড়বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আজ আবার কি খবর? ঘড়াটা উঠানে ফেলেছ কেন? হ'য়েছে কি? তোমার জন্যে সমস্ত দিনে কাজকর্ম্ম ক'রে একটু তাসখেল্‌বো তার জো নাই—

বড়বৌ। হবে আর কি? এর চেয়ে আমার মরণ ভাল ছিল—ভোলাদাদা কোথা থেকে তার বোনটাকে নিয়ে এসে আমাকে মুচিবৌ বলে কত তামাসা ক'ল্লে, আর মুখুয্যে-দের অমৃত বাবুও আমাকে কত গালাগালি দিলে—ছি! ছি! সকলকার সাম্‌নে এই অপমানটা করলে, আর তোমার তাস খেলাই বড় হ'ল—

রাগে বাচস্পতি মহাশয়ের টীকি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিতে লাগিল। তিনি প্রথমেই তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিরোমণি মহাশয়ের নিকট যাইয়া শত অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া স্ত্রীর কথিত অপমানের কথা বলিলেন। শিরোমণি মহাশয় আমাকে ভালবাসিতেন—তিনি বলিলেন,

'একথা অবিশ্বাস্য। "বিশ্বাসো নহি কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"। ভোলাদাদা ভুলিয়া একটা কথা বলিতে পারে কিন্তু অমৃতের স্বভাব ত এরূপ নয়—আচ্ছা আমি অমৃতের নিকট যাইতেছি।'

ভ্রাতার কাছে সান্ত্বনা না পাইয়া রাগে বাচস্পতি মহাশয়ের

টীকি আরও দুলিতে লাগিল। তিনি মন্নুনগরের বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানাকথা পাড়িয়া সকলকে বলিয়া দিলেন 'ত্যক্তগৃহা! জাতিচ্যুতা! যে অমৃত ও ভোলানাথের সঙ্গে আহারাদি করিবে কিম্বা একত্র বসিবে তাহাকে একঘ'রে করিব।'

এদিকে শিরোমণি মহাশয় আমার নিকট আসিয়া প্রকৃত কথা শুনিলেন—শুনিয়া কহিলেন—

'আমি যেন বিশ্বাস করিলাম—কিন্তু গ্রামের অন্য লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? তার উপায় কি? সকলে যে তোমাদের এক'ঘরে করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমি তোমাদের পক্ষে থাকিব কারণ তোমাদের পক্ষেই সত্য আছে।'

গ্রামে ভয়ানক দলাদলি বাঁধিল—এমন কি আমরা স্নান করিতে গঙ্গায় যাইলে পথে লোকে ঢিল ছুড়িয়া মারিত। চারিদিকে দেখি কমিটী বসিয়াছে—দুইদলে দেখা হইলেই ঘুসাঘুসি ও কীলাকীলি। ছড়া ও গানের ত কথাই নাই। বাচস্পতি মহাশয়ের দলের লোক বলে 'মহিমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও; আর অমৃত ও ভোলানাথ প্রায়শ্চিত্ত করুক নচেৎ তাহাদের সঙ্গে মিলিব না।'

এই দলাদলিতে যে উৎসাহ, যে কার্য্যতৎপরতা গ্রামে দেখিলাম সৎকার্য্যে গ্রামবাসীদিগের যদি তাহার অর্দ্ধেক থাকিত তবে আমরা এমন পতিত জাতি হইতাম না। যাহা হউক লজ্জার কথা আর বাড়াইয়া কাজ নাই। সাতদিন গ্রামে এই আগুন জ্বলিল—শেষে শিরোমণি মহাশয় সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন—

"মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ" 'এই দলাদলি বিষয়ে বিচার করা

যাউক। অমৃত,সুষমা,মহিমা প্রভৃতির কি বলিবার আছে তাহা না শুনিয়া তাহাদের শাস্তি বিধান করা নিতান্ত অসঙ্গত। আমার প্রস্তাব এই যে উভয় দলের তিনজন করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মুখে তাহাদের সকলের কথা শুনা যাউক—শেষে সকলে একমত হইয়া যাহা যুক্তি সিদ্ধ বিবেচনা হয় তাহা করা যাইবে।'

এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। তাহার কারণ এই, প্রকৃত ঘটনা কি—কি জন্য মহিমা ও কামাখ্যা দেশত্যাগী হইয়াছিল—কোথায় তাহারা ছিল—এবং কেন মহিমা ফিরিয়া আসিল—একথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হয় নাই গ্রামে এমন লোক কেহ ছিল না। কৌতূহলে সকল কথাই ভুলাইয়া দেয়! স্বয়ং বাচস্পতি মহাশয়ও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন যে তিনি যেন তাহাদের দলের তিনজন পণ্ডিতের মধ্যে থাকেন—মহিমা প্রভৃতির কথা শুনিতে তাঁর ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে ব্রাহ্মণীর কথিত অপমানও ভুলিয়া গেলেন।

নবম অধ্যায়।

সভা।

"তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্ব কথা মনে করে।
সরে যথা নদী প্রস্রবণ।"

হেমচন্দ্র।

ধন্য সেই কলেজের বিজ্ঞ অধ্যাপক, যাঁহার কথামত আমি 'ডায়েরী' লিখিতে শিখিয়াছিলাম। কোন ইতিহাসই আমার ডায়েরীর মত সত্য নহে—দিন দিন যাহা ঘটিয়াছে সকল কথাই ইহাতে লেখা আছে। আজ ১২ই মাঘ ১২৮৬ সাল। আমাদের বাড়ীর ভিতর বড় দালানে একটী সভা হইয়াছে। শিরোমণি মহাশয়, বাচস্পতি ঠাকুর প্রভৃতি ছয়জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্মুখে এক গালিচার উপর বসিয়াছেন—আর একদিকে মা, সুষমা, মহিমা,মানুর মা ও কুশদিদি একটা মাদুরে বসিয়াছে —মধ্যে আমিও ভোলাদাদা আর একটা গালিচায় বসিয়াছি।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে মহিমা প্রথমে গুরুজনগণকে প্রণাম করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল। সে সকল কথা শুনিয়া সকলেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িল, নীরবে অতি মনোযোগের সহিত সকলে সে কথা শুনিল, কেহ একবার হাতও নাড়িল না—পুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে সকলে মহিমার কথা শুনিতে লাগিল।

দশম অধ্যায়।

—০০—

মহিমার কথা।

"দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়,
চাহিনা সুখসম্পদ ওহে হরি দয়াময়।"

ব্রহ্মসংগীত।

মহিমা বলিল—

"আমি সন্ন্যাসিনী হইয়াছি—আর আপনারা পিতৃতুল্য গুরুজন, আপনাদের কাছে কোন কথা গোপন করিব না; নারায়ণ সাক্ষী আমি সকল কথাই যথাযথ বলিব।

"কেন গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম এবং এতদিন কোথায় ছিলাম সে কথা সমাজকে বলিতে আমি বাধ্য, কারণ পাপকলুষিত স্ত্রী পুরুষকে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

"যিনি আর একজনকে যথার্থ ভাল বাসিয়াছেন, এবং কিছু কাল পরে সে ভালবাসায় নৈরাশ হইয়াছেন, তিনিই আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। এবং যিনি বাহ্যপ্রকৃতিতে নিজের অন্তর দেখিতে পাইয়া স্বভাবের শোভায় আপনার মন হারাইয়াছেন তিনিই আমার কার্য্যের কারণ বুঝিবেন।

যিনি প্রকৃত কবি—কথার কবি নহেন যে, বাক্যাড়ম্বরে প্রকৃতির বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইবেন—কিন্তু বহির্জগতের আত্মার সহিত আপনার আত্মা মিলাইয়া সুখ দুঃখ ভুলিয়া জন্মের মত বিজন বনে বাস করিতে পারেন—তিনিই বুঝিবেন কেমন করিয়া আমি সংসার ছাড়িয়া নির্জন নীলগিরি পর্ব্বতে বাস করিতাম।

"যে দিন মানুর মার মুখে শুনিলাম কামাখ্যাবাবু বলিয়াছেন 'অমৃত হেমলতার সহিত কাশীতে আছে' সেই দিন হইতে আমার সুখ ও শান্তি বিসর্জ্জন গেল। যেমন কখনও ভীষণ রোগে সংসারের সকল লোক মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় তেমনই এই কথা শুনিয়া আমি শান্তি মুক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের শান্ত ভাবগুলি একে একে সকলি হারাইলাম।

"ইহার পূর্ব্বে আমি বড় কবিতা ভাল বাসিতাম। ইংরাজী শিখি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা কবিতা পড়িয়াই প্রকৃতির পূজা করিতে শিখিলাম। যাহাকে ভাল বাসিতাম তাহাকে হারাইবার পর কোনও নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া কবিতাময় জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা গেল। এক সুবিধা হইল—এক বৎসর পূর্ব্বে কুশদিদি, বিন্দুর মা ও বিশু যখন শ্রীক্ষেত্রে যায় আমি লুকাইয়া সন্ধ্যার সময় তাহাদের সহিত গঙ্গার ঘাটে দেখা করিলাম এবং হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলাম। আর কেহ জানিল না।

"দিদিকে ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইয়াছিল—কারণ এ সংসারে আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। কিন্তু তীর্থদর্শন আগ্রহে ও সংসার বিতৃষ্ণায় দিদিকেও ত্যাগ করিয়া

যাইলাম। যাইবার কথা তাহাকে বলিতে পারিলাম না, কারণ তাহা হইলে আমার যাওয়া হইত না। নৌকায় উঠিয়া দিদির জন্য কত কাঁদিয়াছিলাম—কিন্তু সঙ্গীগণের বারণ শুনিয়া চুপ করিলাম।

"শ্রীক্ষেত্র যাইতে পথে কত ছোট ছোট তীর্থস্থান আছে তাহাও দেখিয়া যাইতে লাগিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে ভূষণ্ডেশ্বর ঠাকুর, রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে নীলগিরি পর্ব্বতে পঞ্চশিবতীর্থে পৌঁছিলাম—সেখানে যাইয়া আর এক পা নড়িতে ইচ্ছা যাইল না। এমন সুন্দর স্থান আর জগতে বুঝি নাই। এক দিন সকলে সেইখানে থাকিয়া তাহার মাহাত্ম্য বুঝিলাম।

"দেখিলাম দুই পবিত্র উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে—মধ্যে উপত্যকায় ঐ তীর্থ—পার্শ্বে নির্ঝরিণীর ক্রীড়াময় শীতল স্বচ্ছ জল লাফাইয়া লাফাইয়া পর্ব্বত গুহায় প্রতিধ্বনির সৃজন করিয়া পঞ্চশিবের মস্তকের উপরে পড়িয়া আবার লাফাইয়া নিম্নে পার্ব্বতীকুণ্ডে পড়িতেছে। চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে নানা জাতীয় বিহঙ্গমের মধুময় কূজন কর্ণে মিলাইয়া যাইতেছে। কোথায়ও চকিত নয়না হরিণী বৃহৎ উপলখণ্ডের পার্শ্ব হইতে সভয়ে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে—আবার কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে নিকটে আসিয়া নির্ঝরিণীর জল পান করিতেছে। পীনপয়োধরা আরণ্য ধেনু মনের সুখে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোমল কচি শাখাপত্র চর্ব্বণ করিতেছে, হরিণশিশু আসিয়া কখনও ধেনুর মধুক্ষরণশীল স্তনের দুগ্ধ পান করিতেছে, আবার ছুটিয়া গিয়া স্বদলে প্রবেশ করিতেছে।

সুমিষ্টফলভরে অবনত লোহিতবর্ণ পক্কখর্জ্জুর, কৃষ্ণমসৃণ জম্বুফলপূর্ণ নানাজাতি জম্বুবৃক্ষ ও নানাবর্ণেরও সুগঠিত আম্রাদিফলান্বিত বৃক্ষ সকল যেন ফল গ্রহণেচ্ছু মনুষ্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বনফুলের আঘ্রাণ ও নির্ঝরিণীর শীতলতা লইয়া মধুর পবন চারিদিকে ছুটিয়া সকলকে কি এক পবিত্র সমাচার বিতরণ করিতেছে। ক্ষীণ তনু সচঞ্চল মেঘমালা কখনও পর্ব্বত গহ্বরে কখন বৃক্ষাগ্রে কখনও ধূম্রাকার কোমলবেষ্টনে আমাদের চারি-দিকে বেড়িয়া কত রঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, কখনও পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিয়া এক পসলা বৃষ্টিদান করিতেছে।

"সুন্দর সেই তীর্থ স্থানে মনোহরদর্শনা এক ভৈরবী বাস করিত। সে সযত্নে আমাদিগকে পঞ্চাশবতীর্থের সমস্ত দেখা-ইল। এক দিনেই তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা জন্মিল। সে আমাকে তাহার সহিত সেই তীর্থস্থানে বাস করিতে বলিল। অনেক সাধ্য সাধনার পর কুশদিদি আমাকে সেখানে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইলেন এবং সে কথা সকলের নিকট গোপন রাখিতে সম্মত হইলেন। আমি সেই স্থানে রহিলাম—পরদিবস আর সকলে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে যাইল।

"সঙ্গে আমার হরিণশিশু তরু ছিল। ভৈরবী ও আমি সেই গহ্বরে রাত্রে শয়ন করিতাম—তরু গহ্বরের প্রবেশ পথে থাকিত। দিবসে সেই ভৈরবী আমাকে ভগবদ্গীতা পড়াইত। এইরূপে তিন মাস কাল যাইলে ভৈরবীর মৃত্যু হইল। তখন আমি একেলা বাবাজী সাজিয়া তথায় রহিলাম।

"প্রায় সমস্ত দিনই ঠাকুর পূজায় কাটাইতাম। যে সময় ঠাকুর পূজা করিতাম না—তরুর অঙ্গপ্রক্ষালন ও আহারের

আয়োজন করিতাম। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কোমল তৃণাগ্র চিবাইতে চিবাইতে অপরাহ্ণে তরু আমার কাছে ফিরিয়া আসিত এবং ধীরে ধীরে মুখ নাড়িয়া আমার মুখের দিকে তাহার আয়ত নয়নে চাহিয়া আমার কোলে আসিয়া শুইত—যেন সেই নীলগিরির সমস্ত কচিপাতা চিবান হইলেও আমার স্নেহ না পাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

"এইরূপে ছয়মাস কাল অতিবাহিত হইল—কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হইত 'এখানে আসিয়া ত কাহারো উপকার করিতে পারিলাম না—ইহা অপেক্ষা যদি একজন রোগীর শুশ্রূষা করিতে পারিতাম, দরিদ্রকে অন্ন দিতে পারিতাম, একটী ব্যথিত হৃদয় শান্ত করিতাম, অসজ্জিত গৃহ গুছাইতে পারিতাম তবেই আমার প্রকৃত কার্য্য হইত। এ নির্জ্জন গিরিকন্দর বোধ হয় স্ত্রীলোকের জন্য নয়। সংসারই স্ত্রীলোকের রাজত্ব। ঘর-সংসারে থাকিয়া তথায় শান্তি স্থাপনাই স্ত্রীলোকের কার্য্য। গৃহই ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আবাস ভূমি—গৃহ সুখকর শান্তিময় ও পবিত্র করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।'

"আমার মনের অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে এমন সময় একদিন অকস্মাৎ অমৃত বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম ও তাঁহার সহিত মনুনগরে ফিরিয়া আসিলাম।

"আমি বুদ্ধিহীনা কি বলিব জানি না। লজ্জা না করিয়া আপনাদের কাছে সকল কথাই যথাযথ বলিলাম। আমার ক্ষুদ্র জীবনে দুঃখ অনেক পাইয়াছি—আমার কষ্ট নিবারণের জন্য সমাজের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা করিতে আপনাদের বারণ করিতেছি না। যদি আপনাদের বিবেচনায় আমি ধর্ম্মে পতিত

হইয়াছি ইহাই সিদ্ধ হয় তবে দুঃখিনীকন্যা বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন না—আমি আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় সেই নির্জ্জন গিরিকন্দরে গিয়া দেবসেবায় দিন কাটাইব। আর যদি এই বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া সমাজে স্থান দেন তবেই সমাজের হিতের জন্য মনুনগরে বাস করিব।"

একাদশ অধ্যায়।

—— *00* ——

মানুরমার কথা।

"The short and simple annals of the poor."

Gray.

মহিমার কথা শেষ হইলে সকলকে প্রণাম করিয়া মহিমা সে সভা হইতে চলিয়া গেল—বৃদ্ধেরা সকলে স্নেহ ও দুঃখসম্ভূত চক্ষের জল মুছিল। আমি ইহা সুলক্ষণ ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলাম।

তখন শিরোমণি মহাশয় 'আর কেহ কিছু জানে?' জিজ্ঞাসা করিলেন। কামাখ্যার ঝি মানুরমা এই কথা শুনিয়া নিকটে আসিয়া বসিল। মানুরমাকে সকলেই অতি বিশ্বাসী ও সত্যবাদী

বলিয়া জানিত—তাহার কি বক্তব্য আছে শুনিতে সকলেরই আগ্রহ হইল।

বৃদ্ধা মানুর মা বলিল—

"পরণাম শিরোমণি মহাশয় ও বামুন পণ্ডিতেরা আমার কথায় কেউ হাস্‌বেন না—আমি মুরুখ্যু মানুষ শুরুদ্ধ ভাষা জানি না। আমাদের সেকালে মেয়েরা ইস্কুলে যেত না—ব'ই প'ড়তনা—জামা গায়ে জুতো পায়ে দিত না—গাড়ী চড়ে বেড়াত না; ছেলেরা বাদশাহী চুরুট মুখে দিত না, কচিমুখে বুড়া কথা কইত না। কালে কালে কতই হবে। মরণ আমার! কি ব'লতে কি ব'লচি!

"আমার দাদাবাবুর সব ভাল কেবল তিনি হিঁদুর ছেলে হ'য়ে কুলীন বামুনের ঘরে জন্মেও হিন্দু ধর্ম্ম মান্‌তেন না। হিন্দুধর্ম্মে একটা কথা আছে—

যত হাসি তত কান্না
ব'লে গেছে রাম সন্না॥

এমন কথাটা অগ্রাহ্য ক'রতে আছে? আর দাদাবাবুরই বা দোষ কি? দোষ ইংরেজী বই'য়ের। ইংরেজী ব'ইয়ে নাকি লেখে বাপ মাকে খেতে দেবে না, ঠাকুর দেবতা মান্‌বে না, যা তা খাবে—এমন বই গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌লেই তাদের ঠিক সংকার হয়; হরি! হরি! আবার বাজে কথা এসে পড়্‌লো। বুড় বয়সে মনটা বড় পিছল হয়ে পড়ে, সহজেই একটা কথা থেকে আর একটায় গ'ড়িয়ে যায়—হরিহে! তুমিই সার—

"দাদাবাবুর বের পর তাঁদের কেবল হাসি, কেবল হাসি। সে কালে দিনের বেলায় স্ত্রীতে স্বামীতে দেখা হ'ত না। লোকের

লজ্জাসরম ছিল এখন কিনা দিনের বেলা কথা কওয়া! ব'ই পড়া! নৌকা বেড়ান! ওমা! যাব কোথায়? কালে কালে কত কি হবে—

দূর ছাই, সেই কথাটাই মনে পড়ে,

হরিহে! তুমিই সার
তোমা বিনা কেহ নাহি আর।

"বৌদিদিকে এত বুঝালেম্ তিনিও শুনলেন না। দিন যায় রয় না। হাসির ফল ফল্‌লো—গরিব রামশন্নার কথাটা ঠিক হল—যেমন হাসি হ'চ্ছিল মহি যখন লুকিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেল তখন আবার তেম্‌নি কান্না উঠ্‌লো। সদানন্দ দাদাবাবুও বিষণ্ণ হ'লেন—দিদিমণি ত রোজ ডাক্‌ছেড়ে কাঁদ্‌তে লাগলো।

"অত কান্নাও ভাল নয়। যে বাড়ীতে অত কাঁদাকাটী লক্ষ্মী তথায় থাকেন না। আমি দিদিমণিকে বুঝাইলাম যে কান্নায় কান্না বাড়ে—কিন্তু তিনি এবারও আমার কথা শুন্‌লেন না। আমাকে কাজেই চুপ্ করে থাক্‌তে হল, কিন্তু আমি ভাব্‌লুম আর একটা বিপদ ঘ'টবে।

"একদিন বেস্পতিবার বিকেলে দাদাবাবু এই চিঠি খানি পেলেন। পূর্ব্বেই ব'লেছি আমি মুরুখ্যু মানুষ কাগজে আঁচড় মাচড় বুঝিনি। শিরোমণি মহাশয় চিঠি খানি পড়ুন। এই চিঠিতে কি আশ্চয্যি কথা আছে যে, দাদাবাবু ইহা পেয়েই দাঁড়িয়ে উট্‌লেন এবং চারিদিকে পাইচারি ক'রতে লাগ্‌লেন —পরে মাথায় হাত দিয়ে ব'সলেন। তার কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর এসে ব'ললেন—

‘এখনি আমাকে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বিদেশ যেতে হবে, তিন চারিদিন পরে ফিরে আস্‌বো।’ আমি বারণ ক’রলুম “বেস্পতিবারের বার বেলা কোথায় যাবে ?

যদি পাও রাজ্যি দেশ
তবু না যেও বেস্পতির শেষ —”

দাদাবাবু ব’ললেন ‘এ রাজ্যের মতই জিনিষ বটে’ এবং আমাদের বারণ না শুনিয়া একঘণ্টার মধ্যে বিদেশে গেলেন।

“সেই যাওয়া—আহা! সেই অবধি আর তিনি বাড়ী ফেরেন নি। চিঠিখানি অন্যমনস্কে বাহিরের ঘরে ফেলে গেছ্‌লেন—পরের দিন সকালে ঘরঝাঁট দিতে আমি কুড়িয়ে পেলুম।

“আমার দিদিমণির মত দুঃখী আর কে আছে ? এ দুঃখ যে ফুরায় না—গঙ্গার স্রোতে জোয়ার ভাঁটা আছে, কিন্তু সুষমা-দিদির দুঃখ বন্যার গঙ্গার মত এক দিকেই বহিছে। আমার রক্ত দিয়ে যদি তাঁর দুঃখ মিটাতে পারি তাও স্বীকার, কিন্তু তাত হবার নয়। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি ‘ঠাকুর! দাদাবাবুকে বাড়ী ফিরিয়ে এনে সুষমার দুঃখ দূর কর’—কখনও আমার নিজের জন্যে ঠাকুরকে ব’লিনা। আমার আর কি ? যাদের চিরকাল নুন খেলুম তাদের ভাল দেখে ম’রতে পার্‌লেই আমার ভাল—

“আর—মহি এখন এসেছে। তাকে সমাজে নেবে তার জন্যে আবার সভা কেন ? তার মত ভাল মেয়ে হয় নি, হবে না। আর সব সোন্দর মেয়েদের মত মহির রূপের দেমাক্‌ নেই। আর এত গুণই বা কার ? রান্নায় কিম্বা সংসারের

আর আর কাজে, মিষ্টকথায়, পরের জন্যে কষ্ট পেতে, ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে মহির মত ভাল মেয়ে আর কে আছে? সে তীর্থস্থানে ঠাকুর সেবায় ছিল—তাকে সমাজে নেবে না ত কাকে নেবে? তার মুখ দেখ্‌লে আমার বোধ হয় সরস্বতী ঠাক্‌রুণ মহির বেশ ধ'রে পির্‌থিবীতে এসেচে!

"আমার কথা শেষ হ'য়েচে। অত বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, মুখে যা এল তাই ব'ললুম—পরণাম, শিরোমণি মহাশয় ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণ! আমার কোন দোষ ধ'রবেন না—হরিহে! তুমিই সার"—

দ্বাদশ অধ্যায়।

হেমলতার চিঠি ও রায়।

"স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতোহি লোকঃ"

অধ্যাত্মরামায়ণ।

মানুর মার কথা শেষ হইলে তাহার কথিত চিঠিখানি শিরোমণি মহাশয় পাঠ করিলেন—

"পরম পুজনীয় শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীচরণেষু—

"সেবিকা চিরদাসী হেমলতার নিবেদন—

"আপনাকে এই পত্র লিখিয়া জ্বালাতন করিতাম না, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিয়াই লিখিলাম। আমি মরণাপন্ন কাশ রোগগ্রস্ত হইয়াছি। কবিরাজ আজ সকালে বলিয়া গিয়াছে যে আর দুই দিন মাত্র বাঁচিব; মরিবার পূর্ব্বে যদি কোন কার্য্য থাকে তাহা যেন ইতিমধ্যে সম্পন্ন করি।

"একটী বিশেষ কার্য্য আছে। আপনি এ দাসীকে ত্যাগ করিয়া যাইবার একমাস পরে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে মাতা সম্বোধন করে এবং আমার বাসায় তিন দিন অবস্থিতি করে। যাইবার দিন সে বলিল 'মা! আমি যোগবলে আপনার দুঃখের কথা সমস্তই অবগত হইয়াছি—সে দুঃখ শান্তির জন্য এই হীরক খণ্ড আপনাকে প্রদান করিতে আসিয়াছিলাম ইহার মূল্য অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা। হিমাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ইহা কুড়াইয়া পাই। আমি সন্ন্যাসী, এ রত্ন লইয়া কি করিব? আপনাকে দিতেছি, কারণ পূর্ব্বজন্মে আপনি আমার মা ছিলেন। এই অর্থে আপনার দুঃখের উপশম হইবে। ইহা গ্রহণ করুন—আমি আবার নিশ্চিন্তে ধবলাগিরি সন্নিধানে যাই।'

"এই বলিয়া সন্ন্যাসী হীরক খণ্ড আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি যত্নে সে রত্ন রক্ষা করিয়াছি—রোজ ভাবি আপনি আবার ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু হতভাগিনীর কপাল দোষে আপনি আসিলেন না।

"এখন মরিতে বসিয়াছি—এরত্ন আর কাহাকে দিব ? মাঝে মাঝে কলহ সত্বেও পৃথিবীতে আপনার মত কাহাকে আপনার ভাবি নাই—সেই জন্য ইহা আপনাকে দিতে মনস্থ করিয়াছি—কেবল এই ভিক্ষা যে আমি মরিয়া গেলে যেন আমার যথাবিধি সৎকার হয়।

"আর অধিক কি লিখিব ? এতদিন যে ঠাকুর সেবা করিয়াছি তাঁহারই কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি এই চিঠি যেন শীঘ্র আপনার হস্তগত হয়—মরণের পূর্ব্বে যেন আর একবার আপনাকে দেখিতে পাই এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।

"শ্রীচরণে দাসীর যে অপরাধ হইয়াছে সকলি ক্ষমা করিবেন। যে বাসায় আপনি আমাকে রাখিয়া গিয়াছিলেন আমি সেই খানেই আছি। পত্রপাঠ এখানে আসিবেন বিলম্ব করিলে আমার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই।

দাসী হেমলতা।"

পত্র পাঠ হইলে আমি বুঝিলাম হেমলতা প্রতিহিংসার জন্য কামাখ্যাকে লইয়া যাইতে এই ফাঁদ পাতিয়াছিল—এই চিঠির সর্ব্বৈব মিথ্যা—কেবল ছলনা করিয়া কামাখ্যাকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য হেমলতা এই পথ অবলম্বন করিয়াছে। যদি কাশীতে হেমলতার সহিত সাক্ষাৎ না হইত, যদি তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু না দেখিতাম, যদি তাহার কামাখ্যার সর্ব্বনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা না শুনিতাম তবে এ শঙ্কা মনে উদয় হইত না। কিন্তু আমি যাহা জানিতাম তাহা স্মরণ করিয়া ভাবিলাম 'যে বিষ হেমলতার নিকট সর্ব্বদাই থাকিত

তাহাই সে কামাখ্যাকে খাওয়াইল কি? কিম্বা সেই ছুরিকা কামাখ্যার হৃদয়ে বিদ্ধ করিল?' ভাবিয়া আমার চক্ষে জল আসিল।

তখন আমি হেমলতার সহিত কাশীতে আমার সাক্ষাতের কথা সমবেত সকলকে বলিলাম। সকলেই কামাখ্যার বিপদ গণনা করিল।

তার পর কুশদিদি, বিন্দুর মা ও বিশু মহিমাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চশিবতীর্থে রাখিয়া আসিবার কথা বলিল।

তাহাদের কথা শেষ হইলে ভোলাদাদা ও আমি পঞ্চশিব-তীর্থে মহিমামিলনের কথা বলিলাম।

"সত্যমেব জয়তে"—এ সকল কথা শুনিয়া কেহ একবার অবিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ নাসিকা কুঞ্চন করিল না, সকলেই এক মনে অবনতমস্তকে স্থিরভাবে শুনিল—দুএকটী বৃদ্ধ কেবল এক এক বার চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে দুঃখব্যঞ্জক মাথা নাড়িয়াছিল।

তথাপি প্রমাণ শেষ হইলে আমি চিন্তিত হইলাম। 'পণ্ডিত মণ্ডলীর ও মার কি মত হইবে? মহিমাকে কি সমাজে গ্রহণ করিবে? না হয় আবার দুইজনে যাইয়া সেই তীর্থস্থানে বাস করিব'—আমি উৎকণ্ঠার সহিত ইহাই ভাবিতে লাগিলাম— ইহার পূর্ব্বে উৎকণ্ঠা কাহাকে বলে জানিতাম না। আমি যেন খুন মোকদ্দামার আসামী বিচারকের রায় শুনিবার অপেক্ষায় আছি।

শিরোমণি মহাশয়, অন্য পণ্ডিতগণ, কুশদিদি ও মা অনেক-ক্ষণ মৃদুস্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন—সেই সময়টা আমার এক যুগ মনে হইল—শিরোমণি মহাশয় অবশেষে এই অমৃততুল্য কথাগুলি বলিলেন—

"প্রজানামেব হিতায় সমাজবন্ধনং ভবেৎ—

"আমরা সকলেই একমনে স্থির করিলাম—মহিমা যখন ধর্ম্মোদ্দেশে গৃহত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম্মব্রতে দিন কাটাইয়াছে তখন তাহাকে সমাজে লইতে কোন আপত্তি নাই।

"অমৃতের সহিত মহিমার বিবাহে সকলেরই সম্পূর্ণ মত আছে। মহিমা কুলীনকন্যা—তাহার বয়সে বিবাহে কোন দোষ নাই। আগামী ফাল্গুন মাসের ১৫ তারিখ শুভদিন —সেই দিনে এ শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এমন একাধিচিত্ত বরকন্যার বিবাহে কার না আনন্দ হইবে? মহিমা ও অমৃতের মত মনুষ্য গ্রামে থাকিলে গ্রামের মঙ্গল।

"হায়! কামাখ্যা! তুমি অমৃতের বন্ধু ছিলে—তুমিও অমৃতের ন্যায় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান! তুমিও ত সেইরূপ সুখী হইতে পারিতে! কেন ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে? কত লোককে কাঁদাইলে—আপনি ততোধিক যন্ত্রণা পাইয়া থাকিবে।

'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—এই মন্ত্র যদি সাধন করিতে, তবে তুমিও চিরদিন সুখী হইতে, তোমার জন্য সুষমা এত দুঃখ পাইত না।

"অমৃত! তুমি এ জীবনে যাহা দেখিলে ও শিখিলে এরূপ অল্প লোকেরই ভাগ্যে হয়। এ সকল কথা মনে রাখিও।"

সভাভঙ্গ হইল।

সকলেরই মনে আনন্দ—বাচস্পতি মহাশয় পর্য্যন্ত আমার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন—

"অমৃতবাবু! দিব্য কন্যারত্ন লাভ করিলে—ভোলাদাদার

সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাইয়া বড়বৌয়ের সহিত মনান্তরটা মিটিয়ে ফেল।”

ছড়াপ্রিয়া কুশদিদি আমার কাণে কাণে বলিলেন—

“যতনেতে দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ।
তীর্থস্থানে অবশেষে মিলিল রতন॥

তোর তাই হ'ল। মহিমা ও তোর গন্ধর্ব্ব বিবাহ পূর্ব্বে হ'য়ে গেছে। আমি গন্ধর্ব্ব বিবাহের বাসর কখনও জাগি নাই—এইবার জাগিব।”

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—oo—

পূর্ব্বছায়া।

“Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound.”

A. Pope.

কুঞ্জপুকুরের ধারে ছিরু ধোপা হুস্ হুস্ করিয়া কাপড় কাচিতেছিল—নিকট দিয়া বিশু নাপিত ক্ষৌরিকার্য্যের দপ্তর বগলে করিয়া আনন্দিত মনে যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে ডাকিল—

"কি হে বিশু ভায়া! বলি আজ এমন হাসিমুখ কেন? আমরা একটু আহ্লাদের ভাগ পাই না? হয়েছে কি? আপনার মনে মস্ মস্ ক'রে চলেছ কোথায়?"

বিশু নাপিত বলিল "তোমরা আর ভাগ পাবে কি? চির-কাল ময়লা কাপড় কেচে মর—আমোদের সময় আমরা—এই বাবুর বাড়ীতে বিয়ে—টোপরের ফরমাজ্ হ'য়েছে—নরসুন্দরের কত মান্য তা তোমরা জান্‌বে কি?"

ছিরু। সত্য নাকি? ও হরিচরণ! বিশুবাবুর জন্যে একটা মাদুর নিয়ে আয়, আর এক ক'লকে তামাক নিয়ে আয়—

বিশু। তামাসা রেখে দাও—লক্ষ্মীটি ভাই! এক ক'লকে ত'মাক খাওয়াতে পার?

ছিরু। তোমার এখন মান্য বড়—তামাক যদি জলে গুলে খাও ত এনে দিই—

বিশু। তোর পায়ে পড়ি ছিরু ভায়া—আমরা সব এক শ্রেণীর লোক—তোর বাড়ী কাছে, একটু ত'মাক সেজে নিয়ে আয় না—

ছিরু তামাক আনিল—দুইজনে ব্যস্ত মনে তাহা পুড়াইয়া গুল্ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইল—

তার পর ছিরু বলিল—

"ভায়া সব বা ফেঁসে যায়—গুজব কি শুনেছ ত?"

বিশু। কি ফেঁসে যায়? বাবুর বাড়ীর বিয়ে? অমন কথা মুখে আনিস্ নি—গুজব কি?

ছিরু। গুজব কেন? আমার স্বচক্ষে দেখা ব'ললেই

হয়—আমার ভাইপো বোয়ের বোন্‌ঝি জামাই নীরু সেদিন ক্ষার আনতে রামনগরে গিয়ে এক পাগল সন্ন্যাসী ঠাকুরের সাক্ষাৎ পায় সে নীরুকে জিজ্ঞাসা ক'রলে 'মহিমা মনুনগরে এসেচে?' নীরু ব'ললে 'সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমার সে সব খোঁজে কাজ কি? জাননা যে আগামী ১৫ই ফাল্গুন মহিমার ও অমৃত বাবুর বিয়ে?' তা শুনে সন্ন্যাসী ঠাকুর তিনবার মাথা নেড়েচে —তার মানে কি?

বিশু। সত্য নাকি? তার মানে যে বিবাহে বাঁধা প'ড়বে—আরো লোকে ভোলাদাদার নূতন ঝির কথা নিয়ে কত কাণাকাণি করে শুন্‌তে পাই—

ছিরু। কি বলে?

বিশু। কাহাকে বলিস্‌ নি—বলে নতুন ঝি নাকি হেমলতা—

ছিরু। সে কি রে?

বিশু। ভদ্দর ঘরের কথা বলিস্‌নে ভাই—আমরা বেশ আছি—আমার ভয় হ'চ্চে গ্রামে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘট্‌বে—

ছিরু। তাইতো—

বিশু। 'তাইতো' ব'লে গালে হাত দিলি কেন? যা হবার তা হবে—তুই তোর কাপড় আচ্‌ড়া—আমি টোপরের ফরমাসে যাই।

বিশু চলিয়া গেল—কিন্তু যাইবার সময় তাহার মুখ হইতে আনন্দের ভাব তিরোহিত হইয়াছিল।

আমারও হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। এ জীবনস্রোত যতই পরিণাম-সাগর সন্নিকটে আসিতেছে ততই শোকনীরের গম্ভীরতা এবং চিন্তাতরঙ্গের চপলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এতদূর অবধি পড়িয়া দেখিলাম ভোলাদাদার, হেমলতার, সুষমার, মহিমার ও কামাখ্যার অঙ্কিত চরিত্র অনেকটা তাহাদের মতই হইয়াছে—কিন্তু সেই ভীষণ পরিণামের চিত্রে তাহাদের সকলকে ঠিক দেখাইতে পারিব কি ?

সে পরিণামের জন্য দায়ী কে ? তাহা কি ভোলাদাদার চিন্তাশূন্যতার ফল ? অথবা কামাখ্যার ধর্ম্মহীনতাই তাহার কারণ ? কিম্বা সুষমার নিরীহতাই এত বিপদের মূল ? অথবা আমার কোন দোষে এ সমস্ত আপদ হইল ?

বিজ্ঞ পাঠকগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

——oo——

ভোলাদাদার নূতন ঝি।

"I agree with you that she ought never to have come back, that it was an act little short of madness: but are you quite sure that you would not have done the same under the facility and the temptation ?"—

East Lynne.

১৫ই ফাল্গুন এখনও একমাস দূরে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যদেব উঠিয়া সম্পূর্ণ বার ঘণ্টা বিরাজ করিয়া সন্ধ্যার

সময় পশ্চিমগগণে অস্ত যাইবেন। আবার পর দিবস প্রাতে আসিয়া ধীরে ধীরে আকাশে চলিবেন। এই রূপ ত্রিশবার আস্তে আস্তে যাতায়াত করিলে তবে ১৫ই ফাল্গুন আসিবে। তপনদেব! তোমার একটু দয়া নাই?

সুষমা ও মহিমা উভয়েই এখন ভোলাদাদার বাড়ীতে আছে। বুড়ো ঝি মানুরমার অসুখ করিয়াছে—ভোলাদাদার বাড়ীতে একজন নূতন ঝি আসিয়াছে। সে শুনিয়াছি ঘোষেদের ঝির সম্পর্কে মাসতুত বোন্। নূতন ঝির বয়স বেশী নয়—কিন্তু একটা চক্ষু কাণা—সে অতি শীর্ণা—এবং আগুণে পুড়িয়া মুখ ও হস্তপদাদি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ভোলাদাদাকে সে অত্যন্ত যত্ন করে—ভোলাদাদার খুড়িমা এখন বৃদ্ধা হইয়াছে তাহারও খুব সেবা করে। সুষমার ও মহিমার ঝির প্রয়োজন হয় না—নূতন ঝি তাহাদের সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না—কাজ কর্ম্ম শেষ হ'লে আপনার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছে নূতন ঝি ঘরের দ্বার রোধ করিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

নূতন ঝি প্রায়ই বাড়ীর বাহির হয় না, অতি অল্প কথা কয়, সর্ব্বদাই কাজ করে। ঘোষেদের ঝি বলিয়া দিয়াছে 'এ আমার আপনার লোক, খুব বিশ্বাসী'—সকলে বুঝিল তাহাই ঠিক। কিন্তু লুকাইয়া কাঁদে কেন? আবার কোন কোন দিন কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্কে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে, কেহ একটু কথা বলিলে চোখের জল পড়ে।

আমি একদিন ভোলাদাদার বাড়ীতে যাইলাম—নূতন ঝি আমাকে দেখিয়া চমকিয়া সরিয়া গেল—আমি তাহা দেখিয়া

ভাবিলাম 'এ যদি আমাকে পূর্ব্বে না চিনিত তবে কখনই আমাকে দেখিয়া চমকিত হইত না—কে এ?'

শেষে মনে একটা সন্দেহ হইল—নূতন ঝি ত হেমলতা নয়? কাশীতে যখন হেমলতাকে দেখিয়াছিলাম তখন সে এইরূপ শীর্ণা হইয়াছিল, তখনই তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তার পর হয়ত আগুণে পুড়িয়া হেমলতার এইরূপ বিকৃত আকৃতি হইয়াছে। যদি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে কাশীতে না দেখিতাম তবে এই নূতন ঝি যে হেমলতা সে কথা মনেই আসিত না—কারণ তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই।

সে সন্দেহ তখন ভঞ্জন হইল না—কারণ ভোলাদাদা তখনই আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তাহার সেই পূর্ব্ব কথিত পাঠগৃহে লইয়া গেলেন—সেখানে প্রাচীন কাব্য পাঠে তুইজনে আর সকল কথাই ভুলিয়া গেলাম।

ষোড়শ অধ্যায়।

পরিণাম আরম্ভ।

"অস্ত গেল রবি জলধির জলে,
অস্ত গেল প্রেম নিরাশা সাগরে॥"

নবীনচন্দ্র সেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ছাদে বসিয়া আছি, ভোলাদাদা আসিয়া বলিলেন গ্রামে এক নূতন পাগল সন্ন্যাসী আসিয়াছে—শরীর তার ধূলায় ধূসর—মাথায় জটা—পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র—মুখে কথা নাই। পাগলে হাসে কাঁদে গায়, এ পাগল হাসে না গায় না শুধু কাঁদে। সে গঙ্গাতীর হইতে ভোলদাদার বাহির বাটীতে আসিয়াছে—ভোলাদাদা বিরক্ত হইয়া তাহাকে তাড়াইবার জন্য মারিতে উদ্যত হইলেন—তথাপি পাগল নড়িল না—পরিচিত লোকের ন্যায় আসিয়া ভোলাদাদার পাঠগৃহের বারাণ্ডায় সন্ন্যাসী বসিলে—ভোলাদাদা বলিলেন—

'শালা যেন শ্বশুঁর বাড়ী পেঁয়েছে' এই কথায় যেন কি বুঝিয়া ভোলাদাদার মুখপানে চাহিল এবং হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইল।

ভোলাদাদা আরও বিরক্ত হইবার কারণ এই যে সে দিন তাঁহার বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছিল। তাঁর শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী (হেমলতার পিতামাতা) পঞ্চতীর্থে যাইতেছেন—নৌকায়

মন্নুনগর অবধি আসিয়াছেন—মন্নুনগর হইতে ট্রেণে যাইবেন। হেমলতা নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি তাঁহার পিতামাতা শোকে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন—সে শোক মুছিবার জন্য স্বামীস্ত্রীতে তীর্থ যাত্রায় বাহির হইয়াছেন।

পাগল নড়িল না দেখিয়া ভোলাদাদার শ্বাশুড়ী বলিলেন 'থাক্, পাগলটা ওখানে ব'সে থাক্‌লে আর কি ক্ষতি হইবে? আহা! ওকে মের না'—ভোলাদাদা তখন ক্ষান্ত হইলেন, এবং পাগলের বৃত্তান্ত বলিবার জন্য আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নির্ভয়ে থাকিতে বলিয়া বিদায় দিলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়।

——oo——

'আর একঘণ্টা বাঁচিব।'

'Anywhere anywhere out of this world.'

Hood.

সেই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভোলাদাদা আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিলেন 'শীঘ্র এস'—আমি ভোলাদাদার নিকটে আসিয়া 'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ব'ললেন, 'নূতন ঝি বিষ খেয়েচে—আর তোমাকে ডাক্‌চে।'

দ্রুতপদে দুইজনে ভোলাদাদার বাড়ী যাইয়া নূতন ঝি যে ঘরে থাকিত তথায় প্রবেশ করিলাম। সেই ঘরে এক বিছানার উপর শুইয়া নূতন ঝি এপাশ ওপাশ ফিরিতেছে,—তখন তার পরিধানে একখানি সুন্দর ঢাকাই কাপড়, পরিষ্কার করিয়া চুল বাঁধা ও পায়ে আল্‌তা দেওয়া এবং গায়ে দুএকখানা গহনাও আছে। তার চারিদিকে ঘিরিয়া মহিমা, সুষমা, ভোলা-দাদার শ্বাশুড়ী ও খুড়িমা দাঁড়াইয়া আছে। ভোলাদাদার শ্বশুর একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছেন—সকলেই ব্যাপার না বুঝিয়া স্তম্ভিত ও কি করিবে না বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্ন—কেহ একবার নূতন ঝিকে বাতাস করিতেছে, আবার ভয়ে ও বিস্ময়ে হাতের পাখা চলিতেছে না—কেহ তার মুখে জল দিতেছে আবার পরক্ষণেই 'কি হইল?' বলিয়া কাঁদিতেছে—গৃহের প্রদীপটাও যেন বিস্ময়ে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে!

এতক্ষণ নূতন ঝি কোন কথা কয় নাই—ভোলাদাদা ও আমি তথায় পৌঁছিলে সে বলিল—

"সকলে আসিয়াছেন—আমার কথা শুনুন—আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট—যে বিষ খাইয়াছি—জোর আর এক ঘণ্টা বাঁচিব—ইহার মধ্যে আমাকে সকল কথাই বলিতে হইবে—আমাকে আপনারা সকলেই জানেন—আমি হেমলতা—"

গৃহস্থের বাড়ীতে নিশীথে অকস্মাৎ দস্যুদল উপস্থিত হইলে গৃহস্থেরা যেমন চমকিত ও ভীত হয়—নূতন ঝির কথা শুনিয়া সকলে ততোধিক চমকিত ও ভীত হইল।

হেমলতার মাতা হেমলতার বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

'ওমা! কি হ'ল! মা হেমলতা! আমার প্রাণের ধন! তোর জন্য আমরা কত কেঁদেছি! তুই বিষ খেলি কেন? আহা! যদি ঘরে ফিরে এসেছিলি, তবে আমাদের ব'ললি না কেন? আর কেহ তোকে ঘরে না নিত, আমি আদর ক'রে নিতাম—যদি জাতে তোকে না নিত, তোকে নিয়ে আমি দেশত্যাগী হ'তাম—ওমা! কি ক'রলি—'

মহিমা, সুষমা ও ভোলাদাদার খুড়িমা সকলেই হেমলতাকে ধরিল—যেন ধরিয়া তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে! সকলেরই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

হেমলতা বলিল—

"তোমরা আমাকে ছাড়। আমি পাপিষ্ঠা, স্পর্শের অযোগ্যা। আমি তোমাদের উপযুক্ত নহি। মরিবার পূর্ব্বে আমার মনের সকল কথা বলিতে ইচ্ছা যাইতেছে। সমস্ত পৃথিবীতে আমার ন্যায় দুঃখিনী আর নাই—এমন দুঃখ যেন কেহ না পায়, আমি সংসার ত্যাগ করিয়া বিধমর বিদেশে একেলা অসীম দুঃখমাঝে নিরাশ্রয়া ছিলাম, সুখের আশে বাঁচিয়া অনন্ত নরকে আসিয়া পড়িয়াছি"—

হেমলতা একটু চুপ করিল, কান্নায় কথা বন্ধ হইল—সুষমা ও মহিমা অঞ্চলে তাহার চক্ষের জল মুছাইল কিন্তু সে দুঃখ যে মুছিবার নয়। কিছুক্ষণ পরে হেমলতা আবার কথা কহিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

---o---

হেমলতা ব্যাঘ্রিনী।

"হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যে অনল দগ্ধকরে,
নিবিবে না সে অনল"—

হেমলতা বলিল—

"মা! একটু থাম অত কাঁদিও না—তোমাদের কান্না শুনিলে আমি পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাই।

"কিরূপে আমি এ গৃহত্যাগ করিয়া কাশীতে যাই এবং তথায় কেমন ছিলাম তাহা অমৃতবাবুকে বলিয়াছি, তিনি আপনাদের বলিবেন। কিন্তু কাহার সঙ্গে তথায় যাই সে কথা তাঁহাকে বলি নাই—এখন বলি—মরিবার সময় কেন কোন কথা গোপন রাখিব? কামাখ্যা—নরাধম কামাখ্যা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহারই মন্ত্রণায় আমি কাশীতে যাই—সেই অবশেষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইল—তার প্রতিশোধের জন্য নিয়ত আমার সঙ্গে এক তীব্র ছুরিকা ও বিষ থাকিত—

"বাল্যকালে এবং বিবাহের কিছুদিন পরেও আমি শান্ত ছিলাম; কিন্তু ক্রমে ক্রমে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি কি ভীষণ কার্য্য সমূহই করিয়াছি!

"অমৃতবাবুর কাছে কামাখ্যার সর্ব্বনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করা অবধি দিবারাত্র তাহারই উপায় ভাবিতে লাগিলাম। রুগ্ন-দেহে দুর্ব্বল হৃদয়ে নিয়ত একই চিন্তা—কিরূপে প্রতিহিংসা সাধন করিব? আমার অনন্ত দুঃখ ও তাহার কারণ ভাবিতে ভাবিতে রুগ্নদেহে বলের সঞ্চার হইল। কখনও নিশীথে নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে বিছানায় বসিয়া কামাখ্যা আমায় কি দশায় ফেলিয়াছে ভাবিতাম—ভাবিয়া ভাবিয়া যেন অদূরে কামাখ্যার ছায়া দেখিতাম—তখন ছুরিকা লইয়া বিছানা হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে সেই ছায়ায় লক্ষ্য করিয়া বাতাসে ছুরিকা বিদ্ধ করিতাম—ক্ষণ পরে আবার আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া বিছানায় আসিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতাম। কখনও অনুভবে কামাখ্যার দেহ মৃত্যুর পূর্ব্বে যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে দেখিতাম—তাহার গৃহ, ঘর, বাগান, সমস্ত ভগ্ন হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে দেখিতাম, দেখিয়া মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইত।

"এজগতে প্রতিহিংসারমত সুখ আর নাই। যে অত্যাচারে পীড়িত হইয়াছে, সেই অত্যাচারীর সর্ব্বনাশ হইলে কি সুখ হয় তাহা বুঝিবে—যে পরিমাণে লোক অপরের দ্বারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, দুর্দ্দশাকারীর বিপদ হইলে লোকের সেইপরিমাণে আনন্দ হয়। কামাখ্যা আমার কি রাখিয়াছে? আমার ধন লইয়াছে, আত্মীয় স্বজন লইয়াছে, স্বাস্থ্য কাড়িয়া লইয়াছে. ঈশ্বর লইয়াছে, স্ত্রীলোকের যাহা সর্ব্বস্বধন সতীত্ব তাহাও অপহরণ করিয়াছে, আর বাঁকি কি আছে? কামাখ্যার সর্ব্বনাশে আমার আনন্দ হইবে না?

"তখন জীবনে এই এক অবলম্বন ছিল—প্রতিহিংসা।

তাহাতেই হৃদয় পোড়াইত—অথচ বাঁচাইয়া রাখিত। মনে হইলে বুক বাড়িত, দ্রুতবেগে চলিতাম, আহার করিতে পারিতাম, নিদ্রাও আসিত, ভাবিতাম এই প্রতিহিংসার জন্য বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

"ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম কামাখ্যাকে কোন ছলনায় কাশীতে আনিতে হইবে। আনিয়া প্রাণহন্তারক বিষ খাওয়াইব? না—তাহাহইলে ত কামাখ্যার যন্ত্রণার শীঘ্রই অন্ত হইবে—আমাকে যে এত বৎসরব্যাপী যন্ত্রণা দিয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ হইবে না। এক সন্ন্যাসীর কাছে ছলে আর এক প্রকার বিষ পাইলাম—তাহা খাইলে মানুষ জন্মের মত পাগল হয়—কিন্তু মধ্যে মধ্যে সজ্ঞান হয়, তখন আবার পূর্ব্বকথা সকলই স্মরণ হয়—আবার কিছু ক্ষণ পরে উন্মাদগ্রস্ত হয়। ভাবিলাম এই কামাখ্যার ঠিক শাস্তি। কাশীতে আনাইয়া এ বিষ খাওয়াইলে কামাখ্যা উন্মাদ ও দেশত্যাগী হইবে। আর ক্ষণে ক্ষণে তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের কথা মনে হইবে, কিরূপে আমাকে জন্মের মত অভাগী করিয়াছে তাহা স্মরণ হইবে—দেখিবে দূর দেশে স্ত্রী পরিজন কত দুঃখভোগ করিতেছে কিন্তু তাহার উপায় বিধান করিতে পারিবে না—তার উপরে সকল যন্ত্রণা অপেক্ষা যন্ত্রণা দায়ী মনস্তাপ তাহাকে দগ্ধ করিবে! এই শাস্তি কামাখ্যাকে দিতে পারিলে আমার কি আনন্দ!

"বিষসংগ্রহ হইল—কিন্তু কি উপায়ে কামাখ্যাকে কাশীতে আনি? জানিতাম সে বড় লোভী, তাই ছলনা করিয়া পাঁচ হাজার টাকার হীরক খণ্ডের লোভ দেখাইয়া আমি যেন তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে

দেখিতে চাই এই রূপ পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম। লোভী কামাখ্যা ফাঁদে পা দিল।

"দূর হইতে কামাখ্যা আসিতেছে দেখিয়া কুঁজার জলে ঐ বিষ মিশাইলাম এবং চাদর গায়ে দিয়া বিছানায় শুইলাম। কামাখ্যা আসিয়া আমার পাশে বসিল—ক্ষমা চাহিল—কত প্রেমের কথা বলিল—আমি তাহার হাতে আমার হাত দিলাম এবং দুই একবার কাশিলাম। কিছুক্ষণ পরে কামাখ্যা বলিল 'বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে একটু জল খাই' এবং সেই কুঁজার জল খাইল।

"দুই মিনিটে বিষ ধরিল। তখন কামাখ্যা আপনার হাত কামড়ায়, পা কামড়ায়, চুল ছিঁড়ে, দৌড়িয়া বেড়ায়। আমার কি আনন্দ! তাহাকে পথের বাহির করিয়া দিয়া বাড়ীর দরজা বন্ধ করিলাম। কামাখ্যা পাগল হইয়া হাসিতে হাসিতে একজনের কাপড় ধরিল—সে হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা কামাখ্যাকে প্রহার করিল—তার মাথায় রক্ত পড়িল ও চক্ষু দিয়া জল গড়াইতে লাগিল—আমি জানালা হইতে দেখিয়া হাসিলাম।

"ক্ষণপরে কামাখ্যার সজ্ঞান মুহূর্ত্ত আসিল—সে ইতস্ততঃ চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া নমস্কার করিল—অনুতাপের অশ্রুধারা চক্ষুতে বহিতে লাগিল। সে ছুটিয়া আমার জানেলার কাছে আসিয়া বলিল, 'হেমলতা! তুমি আমাকে কাশীতে ডাকিয়া আনিয়া এ কি খাওয়াইলে! কোথা সে হীরক? রত্ন দাও' —আমি আমার বুকের কাপড় সরাইয়া দেখাইলাম—

'রত্ন! রত্ন এইখানে ছিল—তুমি হরণ করিয়া আমাকে

কি দুঃখ দিয়াছ জান না? সেই জন্য এই শাস্তি। যাও, তোমার মুখ আর দেখিতে চাহি না। এই আমার বক্ষঃস্থল দেখ—কি আঘাত দিয়াছ মরণ অবধি তাহা ভুলিও না'—কামাখ্যা যোড়হাত করিয়া বলিল –

'হেমলতা! তোমার পায়ে পড়ি -আমায় কি খাওয়াইলে ভাল কর –আমি বড় পাপী। ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে কত পাপ করিয়াছি। দেখ শরীরে রক্ত পড়িতেছে—তদপেক্ষা অন্তরের অগ্নি আরও দহিতেছে। কেন আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলে না?—তোমার বক্ষঃস্থল আবৃত কর --হায়! সকল কথাই মনে পড়িতেছে। যেদিন তোমার সহিত গঙ্গাতীরে সাঁতার দিই, যে দিন কাশীতে আসি, যেদিন বালা লইয়া তোমার সহিত কলহ করি, যেদিন তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাই। উঃ কেন এত পাপ করিলাম! হেমলতা! তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ভাল কর। আহা! দুঃখিনী সুষমার আর কেহ নাই—কেন এমন কার্য্য করিয়াছিলাম!'

"বলিতে বলিতে অবিরল অশ্রুধারায় কামাখ্যার চক্ষু ভাসিয়া গেল—দেখিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলাম!"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

হেমলতা রমণী।

"Smiling they live, and call life pleasure,
To me that cup has been dealt in another measure."
Shelley.

হেমলতা বলিল—

"তার পর আবার কামাখ্যার উন্মাদাবস্থা আসিল। ছুটিয়া কামাখ্যা কোথায় পলাইয়া গেল, আর তাহাকে দেখি নাই। কিন্তু তাহার শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া কামাখ্যা চলিয়া গেলে আমিও কত কাঁদিয়াছি।

"ইহার একমাস পরে এক রাত্রে আমি বিছানার কাছে আলো রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। যখন ঘুম ভাঙ্গিল আমার বিছানায় ও মশারিতে আগুণ লাগিয়াছে, আমার পরিধান বস্ত্রও জ্বলিতেছে! ঘরের দ্বার বন্ধ ছিল সহজে খুলিতে পারিলাম না —তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া আরও বিঘ্ন হইল—সে জ্বলন্ত বস্ত্র খুলিতে পারিলাম না। অগ্নিতে সমস্ত শরীর পুড়িতে লাগিল! যখন দ্বার খুলিলাম তখন অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হইতেছে—আমার চীৎকারে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া আমার বস্ত্র খুলিয়া দিল। তখন আমি অজ্ঞান হইলাম।

"তিনদিন অজ্ঞান ছিলাম। যখন জ্ঞান হইল দেখি যে আমি রাস্তার হাঁসপাতালে রহিয়াছি। এক মাস তথায় থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিলাম কিন্তু সমস্ত শরীরে পোড়ার দাগ রহিল। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু বলিলেন,

'তোমাতে আমি এক নূতন ঘটনা দেখিলাম। পূর্ব্বে এইরূপ কথা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে এরূপ ব্যাপার কখনও দেখি নাই। আমি তোমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম— কিন্তু এখন তোমার অবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা তোমাকে দেখিয়াছে তাহারা কেহ এখন তোমাকে চিনিতে পারিবে না।'

"সেই কথা শুনিয়া মনে আহ্লাদ হইল। একখানি আরসিতে পোড়ারমুখ দেখিলাম—দেখি যথার্থই আর একরূপ হইয়াছি।

"তখন মনে হইল 'এই বার কেন মন্নুনগরে যাই না? এই বার কেন মরিবার পূর্ব্বে একবার মনের সাধ পূরাই না?'

"মন্নুনগরে আসিয়া অন্তরালে ঘোষেদের ঝিকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম—সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে এই বাড়ীতে নূতন ঝি বলিয়া রাখিয়া গেল।

"আসিয়া অবধি কিন্তু আমার প্রাণের যাতনা আরও বাড়িল। স্বামী সেবা করিতেছি, কিন্তু দাসী হইয়া! হায়! যেখানে আমি কর্ত্রী হইয়াছিলাম সেইখানে আমি দাসী! যে কখন সুখভোগ করে নাই তার অসুখে বড় কষ্টবোধ হয় না— কিন্তু যে একবার সুখভোগ করিয়া পরে অনন্ত কষ্টে পড়িয়াছে তার দুঃখ ভুলিবার নয়। এই বাড়ীতে আমি যখন পাপে ডুবি

নাই তখন কেমন ছিলাম, আর এখন কি যন্ত্রণা! বিদেশে বরং ছিলাম ভাল—এক এক বার এসব কথা মনে হইত—এখানে আসিয়া দিবারাত্র অনলে হৃদয় দহিতে লাগিল! সেই গঙ্গার ঘাট, এই বাড়ী, ওই দেয়ালে 'চৈতন্যসংকীর্ত্তনে'র ছবিখানি—যে দিকে চাহি আমার পাপের কথা মনে করিয়া দেয়।—

"জাগ্রত অপেক্ষা ঘুমাইলে আরও যন্ত্রণা। ঘুমাইয়া স্বপ্নে চক্ষের উপর ভীষণ অগ্নিপূর্ণ নরক দেখিতাম—যেন তাহাতে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত শরীর ডুবিতেছে! অত্যন্ত যন্ত্রণায় শরীর জ্বলিবার সময় যেন স্বামীর পদযুগল দেখিয়া দুই হাতে ধরিলাম কিন্তু আমার মুখ দেখিয়া তিনি বলিলেন 'তুই পাপাচরণ করিয়া আমাকে কত লজ্জা ও কষ্ট দিয়াছিস্'—এই বলিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন। আমি যেন আবার সেই অগ্নিপূর্ণ নরকে পড়িতেছি। তখন ভয়ে বিকৃত চীৎকার করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিত। সে স্বপ্ন কি ভয়ানক কষ্টদায়ক!

"শেষে স্বপ্নের ভয়ে নিদ্রা ত্যাগ করিলাম। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতাম—ও সকলে ঘুমাইলে যাতনায় ছুটিয়া ছুটিয়া গঙ্গাতীরে কাঁদিয়া বেড়াইতাম! মুখ ফুটিয়া কাহাকে বলিতে পারিতাম না কেন আমার বুক ফাটিতেছে।

"এমন ভাবে লোক কতদিন বাঁচিতে পারে? ইন্দুরে যেমন ফলের শাঁস খাইয়া শুধু উপরের ছাল টুকু রাখিয়া দেয়, দুঃখে তেমনই আমার হৃদয় অন্তঃশূন্য করিয়াছে!

"শেষে স্থির করিলাম এইবার মরিব। মরিবার পর হয়ত আমার এ অসীম দুঃখের কথা শুনিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি দুঃখ করিয়া বলিবে 'হেমলতা যে পাপ করিয়াছিল ইহজীবনেই

তাহার শাস্তি পাইয়াছে'—কিন্তু আমি সহানুভূতির যোগ্যা নহি।

"কাল পিতামাতাকে এ বাড়ীতে দেখিয়া সকল আশা পূরণ হইল। যে বিষ খাইয়াছি কোন চিকিৎসকের সাধ্য নয় আর আমাকে বাঁচায়। মরিবার পূর্ব্বে ভাবিলাম কুৎসিৎ হইয়া মরিব কেন? তাই ভাল কাপড় ও গহনা পরিয়া, চুল বাঁধিয়া, পায়ে আল্‌তা দিয়া তবে বিষ খাইয়াছি।"

ঊনবিংশ অধ্যায়।

* *

"That grief is common would not make
Mine less—rather more"

Tennyson.

হেমলতা ঐ অবধি বলিয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ সেই দ্বারের সম্মুখে সন্ধ্যাবেলায় সেই পাগল আসিয়া দাঁড়াইল—কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বেই পাগল কথা কহিল—

"হেমলতা! কি বলিলে? সমস্তই আমার—কামাখ্যার দোষ?"

হেমলতার কথা শুনিতে শুনিতে সকলেরই বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—তার উপর হঠাৎ কামাখ্যা আসিয়া সেই দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলে সকলেই বাষ্পাকুল লোচনে স্তম্ভিত

ভাবে কামাখ্যার দিকে ফিরিল কামাখ্যার প্রতি সকলেরই ঘৃণা হইল।

হেমলতার পিতা একখানি দা লইয়া কামাখ্যাকে মারিতে গেলেন ও বলিলেন --

'পাজি! তুইই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্' – এই বলিয়া সেই দা কামাখ্যাকে মারিতে উঠাইলেন—কামাখ্যা নড়িল না—কিন্তু আমি দ্রুতবেগে যাইয়া হেমলতার পিতার হাত ধরিয়া দা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম –

'ছি! আপনি কেন নরহত্যা দোষে দোষী হন ?'

হেমলতার পিতা তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

কামাখ্যা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল 'আমি দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া হেমলতার সকল কথাই শুনিয়াছি—কিন্তু আমি একেলা দোষী নহি'—

আমি কামাখ্যাকে বলিলাম 'ছি! কামাখ্যা! আর কেন সে কথা তুল ? দেখিতেছ না হেমলতার মৃত্যু সন্নিকট ?'

কামাখ্যা বলিল 'আমি যাইতেছি—কিন্তু আমি কি হেমলতার অপেক্ষা কম দুঃখ পাইয়াছি যে তোমরা আমাকে ঘৃণা করিতেছ ? আমি পাগল হইয়াছি কেন ? যে দুঃখ আমি পাইয়াছি—মনুষ্যের ভাষায় এমন কথা নাই যে তাহা অপরকে বুঝাইতে পারি। একদিন সজ্ঞান অবস্থায় মন্নুনগরে ফিরিতে ইচ্ছা গেল—তার পর যখনই সজ্ঞান হইতাম মন্নুনগরের দিকে হাঁটিয়া আসিতাম্; পাগল অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। এই রূপে অশেষ যন্ত্রণায় প্রায় এক বৎসর পরে কাল মন্নুনগরে এই বাটীতে পৌঁছিলাম'—

সুষমা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল—বোধ হয় লজ্জায় কিছু করিতে পারে নাই—কিন্তু সকলেরই সীমা আছে। এই অবধি শুনিয়া সুষমা ক্ষিপ্তার ন্যায় দৌড়াইয়া আসিয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে বসিল এবং ক্ষণপরে উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে তাহাকে লইয়া যাইতেছিল—

তখন অকস্মাৎ মহিমা হেমলতার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া সুষমার হাত ধরিয়া বলিল,

'ছি দিদি! কি কর? লোকে যে নিন্দা করিবে।'

এই বলিয়া মহিমা সুষমার হাত ধরিয়া অন্য ঘরের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। সুষমা প্রথমে যাইতে চাহিল না, কিন্তু মহিমার কাতর মুখ পানে বার বার চাহিয়া শেষে তাহার সঙ্গে চলিল—আমরা দেখিতেছি দুই জনেই অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে চলিয়া যাইতেছে—

সে সময় সকলেই সুষমা ও মহিমার সেই দুঃখের নীরব অভিনয় দেখিতেছিল—হেমলতার দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। হেমলতা সহসা সেই মৃত্যুশয্যায় উঠিয়া বসিল—বসিয়া নিমেষের মধ্যে বুকের কাপড়ের ভিতর হইতে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিল—এবং দ্রুতবেগে কামাখ্যার সম্মুখে যাইয়া সেই ছুরিকা কামাখ্যার বুকে বসাইয়া দিয়া বলিল –

"কি? এখনও প্রতারণা? এখনও বাঁচিবার ও সুখভোগ করিবার ইচ্ছা! এই পাপের পরিণাম হইল!"

ছুরিকাঘাতে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া কামাখ্যা মাটীতে পড়িল—তাহার হৃদয়ের শোণিতস্ফুলিঙ্গে ক্ষীণপ্রভ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। রুধিরময় সেই মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া সকলেই

তখনই উদ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তেক পরে সুষমা সেই অন্ধকার গৃহে আসিয়া শোণিতক্ষেপি কামাখ্যার মৃত দেহের পার্শ্বে নীরবে বসিয়া রহিল—তাহার চক্ষের জল ও কামাখ্যার হৃদয়ের শোণিত এক সঙ্গে মিশিল! এই কি সুষমার প্রাণভরা ভালবাসার অন্ত? হায়! এই কি তার স্বামীর সহিত মিলন?

কুশদিদি আসিয়া সুষমার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে অকস্মাৎ শোকে অধীরা হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া বক্ষঃস্থলে দুইকরে আঘাত করিতে লাগিলেন। কামাখ্যাকে কে না ভালবাসিত?

সে ভীষণ দৃশ্য এখনও যেন চক্ষের উপর দেখিতেছি। যাও কামাখ্যা! এ পৃথিবীতে তোমার জীবন ফুরাইল। তোমার অন্তরে দুইটী আত্মা ছিল, একটী বড় মনোহর তাহাকে আমরা ছেলেবেলায় ভাল বাসিতাম, বড় হইয়াও এক এক দিন তাহার দেখা পাইয়াছি; আর একটী বড় ভয়ানক—তাহা নিজের ও সমাজের সুখ একেবারে নষ্ট করে—হায়! কেন তাহাকে হৃদয়ে পুষিয়াছিলে?

যাও কামাখ্যা! এ জীবনে আর তোমাকে দেখিব না। কিন্তু সমুদ্রে যেমন আলোকগৃহের প্রদীপ দেখিয়া নাবিকেরা বিপদ-স্থান ত্যাগ করে তেমনি তোমার ছবি দেখিয়া যেন বঙ্গীয় যুবকগণ তোমার জীবনপথ ত্যাগ করে। গুণী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, মধুরভাষী কিন্তু ধর্ম্মহীন কামাখ্যা বিদায়! এতদিনে তোমার চঞ্চল মন স্থির হইল, এতদিনে তোমার হৃদয়ের দুরন্ত পিপাসা মিটিল—আমার জীবনের অর্দ্ধেক শান্তি তোমার সঙ্গে চলিয়া গেল!

কামাখ্যাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া হেমলতাও মাটীতে পড়িল।

কামাখ্যাকে মারিবার জন্যই যেন সে বল পাইয়াছিল—কার্য্য সিদ্ধ হইলে তাহার শরীর অবশ হইল---তখন একটু শান্ত হইয়া কুশদিদি একটা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিলেন। সকলেই আবার ছুটিয়া হেমলতার কাছে আসিল—ভোলাদাদাও গেলেন--তখন হেমলতা রুদ্ধস্বরে ধীরে ধীরে বলিল,

"আমার কথা বন্ধ—আর লজ্জা—একটী সাধ মিটাই"—

এই বলিয়া ভোলাদাদার দুই পায়ের উপর হেমলতা মুখ রাখিল—ভোলাদাদাও বসিয়া হেমলতার মাথা তাঁহার কোলে লইলেন—কাহারও মুখে কথা নাই, চক্ষু সকলেরই আর্দ্র।

হেমলতা আবার সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল এবং হাত বাড়াইয়া তাহার জননীর হাত ধরিয়া বলিল,—

"মা—আমি কুলের কলঙ্ক—কি যাতনা! আর কেহ যেন আমার মত সমাজ ত্যাগ না করে"—

এই বলিতে বলিতে হেমলতার মুখ ও শরীর বিবর্ণ হইয়া আসিল—তখনও দুই চক্ষের কোণ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল—তখনই স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া দুঃখিনীর জীবন ফুরাইল!

সমস্ত রাত্রি কামাখ্যার ও হেমলতার মৃত দেহ সেই খানে পড়িয়া রহিল।

সমস্তরাত্রি সকলেই সেখানে কাঁদিলাম। এ পরিণাম নূতন নহে--কত শতাব্দী হইতে দেশে দেশে হেমলতার ন্যায় কত রমণীর ও কামাখ্যার ন্যায় কত পুরুষের এইরূপ পরিণাম হইয়াছে। হায়! আরও কত লোকের কোমল হৃদয়ে কামের পরিণাম স্বরূপ এই প্রকার অসীম যন্ত্রণাদায়ী শেল বিদ্ধ হইবে।

পরিশিষ্ট।

"Love is the fulfilling of the law."

Prof. Drummond.

পূর্ব্বলিখিত ঘটনার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যাহাদের হৃদয়ে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া জীবন অশান্তিময় করিয়াছিল, তাহারা এ পৃথিবী ত্যাগ করাতে গ্রামের দলাদলি মিটিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর মত শান্তি প্রচারক আর নাই।

বিবাহের পর মহিমার ও আমার দিন যে সুখে গিয়াছে তাহা বুঝান অসম্ভব। যে সংসারে প্রেম আছে সেই খানেই হৃদয়স্নিগ্ধকারী শান্তি।

বহুদিন পশ্চাতে চাহিয়া দেখি—প্রেম কি মনুষ্যকে বালক করিয়া তুলে? পূর্ণিমার রাত্রে মহিমা বাপের বাড়ীতে থাকিলে আমি তথা হইতে তাহাকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিবার জন্য চিঠি লিখিতাম এবং আমিও বাড়ী থাকিয়া তাহা দেখিতাম। দুইজনে এক সঙ্গে (যদিও পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া) চন্দ্রমা দেখিয়া আনন্দে ভাসিতাম!

আমাদের বাগানের দীর্ঘিকায় একখানি নৌকা আছে—তাহার নাম দিয়াছি 'তীর্থ'। নিশীথে পৃথিবী নিস্তব্ধ হইলে মহিমা ও আমি বাগানে যাইয়া 'তীর্থ' ভ্রমণ করি, মহিমা হাল ধরে, আমি দাঁড় টানি—ক্ষণপরে বাপীবক্ষে নৌকা ছাড়িয়া দিই। মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণ শরীর শীতল করিয়া বহিয়া যায়, তারকা-

রাজির দূরাগত মধুর কিরণে জল স্থল অস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়, তীরস্থ বৃক্ষশাখায় বসিয়া 'বৌ কথাকও', 'চোখ্ গেল' প্রভৃতি পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতে থাকে। প্রেম বিনা কে কবে শান্তি পাইয়াছে ?

এখন গ্রামের সমস্ত গৃহিণীদের নিকট মহিমা প্রিয়। কাহারও বিপদ হইলে যতক্ষণ না তাহা হইতে উদ্ধার হয়, মহিমা ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয় না। গ্রামশুদ্ধ সকলেই মহিমার দয়ার কীর্ত্তন করে—বিশেষতঃ গরিব দুঃখীরা তাহাকে মার মত ভাবে সেও কন্যারূপে সকলকে যত্ন করে।

আমাদের যে ছোট জমিদারীটুকু আছে তাহার উপস্বত্ব হইতেই স্বচ্ছন্দে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আমাদের গ্রামে কেহ অন্নাভাবে দিনাতিপাত করে না, বস্ত্রাভাবে কাঁদে না। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কাহারও অসুখের কথা শুনিলে—মহিমা ও আমি তখনই আমাদের ডাক্তার সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে যাই। গ্রামে যাহার কোন বিপদ হয়, প্রথমেই আমাদের সংবাদ দেয়।

সুখের সময়ে ও তাই। কাহারও বাটীতে বিবাহাদি হইলে কোমর বান্ধিয়া মহিমা তাহাদের রন্ধন গৃহে রন্ধনকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করে। আনন্দে বাসরঘর জমাইতে হইবে—সেখানেও মহিমা অগ্রসর। এককথায় মহিমাকে লোকে 'ক'নে কুশদিদি' বলে।

যে দিন অন্যকার্য্য না থাকে সন্ধ্যার পর দুইজনে বাগানে যাই—দুইজনে ?—না ; আর এক জন বলিতে পারি না, কোন কোন দিন আর আধ জন আমাদের সঙ্গে যায়—সে আমাদের নবমবর্ষীয়া কন্যা সুমতি। সুমতি তাহার জননীর সকল গুণই

পাইয়াছে, এবং মুখখানি ও অবয়ব মহিমার মত। যে সুমতিকে দেখে সেই তাহাকে ভালবাসে।

পাঠক মহাশয়! যদি কোন কারণে মনুনগরে পদার্পণ করেন তবে আপনাকে সুমতির গান শুনাই—সে বীণানিন্দিত কোমল কণ্ঠের গান শুনিয়া আপনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন, এবং মনুনগর আসিবার পরিশ্রম সফলজ্ঞান করিবেন।

সুমতি কি গান গায়? মহিমার রচিত গান। সুশোভন সেই উদ্যানের নানাজাতি ফুল তুলিয়া সরোবরের প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটে বসিয়া এক এক বার মস্তকঅবনত করিয়া স্বচ্ছসলিলে মুখ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আপনার মনে সুমতি মালা গাঁথে ও গান গায়। আমরা সরোবরের চারিদিকে ছোট ছোট পথগুলিতে বিচরণ করিতে করিতে সুমতির গান শুনি—আর আত্মহারা হইয়া অপত্যস্নেহে ও আনন্দে স্বর্গসুখ অনুভব করি। সুমতির একটী গান লিখিয়া পাঠক মহাশয়কে উপহার দিই ঃ—

"প্রেমের সমান নাহি কিছু আর ;
প্রেমের ধরম ধরমের সার ;
প্রেমের অভাবে সকলি অসার।

"প্রেম বিনা গানেতেও মধুরতা নাই,
প্রেম বিনা ধনদানে কোন পুণ্য নাই,
প্রেম বিনা ভক্তিতেও মুক্তি কভু নাই।

"প্রেমিক যে জন সে কভু না যায়
ত্যজিয়ে সমাজ সুখের আশায়;
সমাজ উন্নতি নিয়ত সে চায়।

"হের প্রেমময় হিন্দুধরমের সনে
মিশিয়াছে কত খাদ দিনে দিনে!
নিজধর্ম্ম ত্যজিবে কি সে কারণে?"

"ধূলা আবরণ পড়িলে সোণায়,
কেহ কি কখন স্বর্ণ ফেলে দেয়?
'নিজধর্ম্ম ত্যজিও না ভাই।

"যত হিন্দু আছে হবে এক মন
মুছিবে ধর্ম্মের ধূলা আবরণ
পুনঃ আর্য্যধর্ম্ম দিবে দরশন।

"ঋষিদিগের মত প্রেম আছে কার?
হিন্দুদের মত হৃদয় কাহার?
আর্য্যধর্ম্মসম ধর্ম্ম নাহি আর।"

সুমতির সেই অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠের মধুর গান মলয় পবন আনন্দে বাগানের চারিদিকে বহন করিয়া ভ্রমর, কোকিল ও 'বৌকথা কও' কে শুনাক্—আমরা পরিচিত কয়েকজনের সংবাদ লই।

সেই নীলগিরি পাহাড়ের উপর পঞ্চশিব তীর্থস্থান—সেই কল্লোলিনী জলপ্রপাতের স্ফটিকজল নাচিতে নাচিতে পার্ব্বতী-কুণ্ডে পড়িতেছে, কত জলবিন্দু পর্ব্বতে প্রতিঘাত হইয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে—রবির কিরণে তন্মধ্যে রামধনুর বর্ণ প্রতিফলিত —সেই দুই পর্ব্বত শৃঙ্গের উন্নত মস্তকে মেঘমালা খেলা করিতেছে—বনফুলের সেই সুগন্ধ আঘ্রাণ যাত্রীর মন আমোদিত করিতেছে। সকলি সেইরূপ আছে—কোথায় হয়ত দুই একটি ছোট লতার পরিবর্ত্তে নূতন লতা জন্মিয়াছে। কিন্তু এই কয়বৎসরে মনুষ্য জীবনে কি অনির্ব্বচনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই পর্ব্বত গহ্বরে যথায় মহিমাকে দেখিয়াছিলাম সেইখানে

এক্ষণে সুষমা আছে—আর কে ও গৈরিকবসনপরিধানা বৃদ্ধা?—মানুর মা। মানুর মা! স্বর্গ নিশ্চয়ই আছে, নহিলে তোমার মত আত্মসুখেচ্ছাশূন্য পরোপকারী রমণীর পুরস্কার কি?

দেবসেবা ভিন্ন সুষমার শান্তি হইল না—তাই সে এখানে বাস করিয়াছে। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহারি সহিত এই খানে বাস করিতেছে। একজনের দোষে কেন অন্যে এত কষ্ট পায়, কেন মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভাগ্যসূত্র এরূপ সম্মিলিত হয় যে একটা ছিন্ন হইলে তাহার সঙ্গে আরও অনেকের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়—তাহা আমরা জানি না। জানি কেবল কামাখ্যার দোষে সুষমা অনাথিনী হইয়াছে—জন্মের মত তাহার সুখসিন্দুর মুছিয়া গিয়াছে—ইহজন্মে আর সে হাসিবে না—

মহিমা ও আমি সুমতিকে লইয়া বৎসরে দুইবার সুষমার নিকটে যাই ও সাত আট দিন সেই খানে বাস করি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া যখন মলিনবসনা আলুলায়িতকুন্তলা সন্ন্যাসিনী সুষমার কথা মনে হয় তখন দুইজনে রোদন সংবরণ করিতে পারি না।—

এখন বিদায়! কিন্তু কলম রাখি রাখি রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। স্থানে স্থানে লিখিতে নিতান্ত দুঃখ হইলেও এবং আমার হৃদয়ের শোণিতের দ্বারা লিখিতেছি মনে হইলেও এই সকল পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মনে এক অপূর্ব্ব ভাব হইয়াছে তাই কলম রাখিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

কুশদিদি বৃদ্ধা হইয়াছেন বটে কিন্তু ছেলেবেলায় যেমন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তেমনই পরোপকার ব্রতে ব্রতী আছেন

এবং বিপদে সম্পদে সমস্ত গ্রামের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন দিনে দিনে নূতন তরুলতায় সুশোভিত হইয়া অশ্বথ বৃক্ষে শীতল ছায়ায় ফলফুলপূর্ণ সেই কুশদিদীর আশ্রমটী আর রমণীয় হইয়াছে।

বাচস্পতিঠাকুর সেইরূপ তাস খেলায় মত্ত, এবং ঘোষেদে বৈটকখানায় তাস খেলিতে খেলিতে ছক্কা কি পঞ্জা জিতিলে সভামধ্যে দাঁড়াইয়া সেইরূপ কোমরে হাতদিয়া নৃত্য করেন।

নির্জন গিরিকন্দরে মহিমার সাথী তরুও মন্নুনগরে আছে যদিও নীলগিরি পর্ব্বতের ন্যায় সুকোমল ও অপর্য্যাপ্ত কাঁ পাতা এবং শাখা পায় না, তবু সে বুঝি কচি পাতার অপেক্ষ কোমল মহিমার স্নেহ পাইয়া আনন্দিত মনে আমাদে বাগানে বিচরণ করে।

ছিরু ধোপা ও তস্ত বিশু ভায়া দেখা হইলে সেইরূপ 'তমাকে' রূপান্তর না করিয়া পৃথক্ হয় না এবং পল্লীগ্রামের খবরাখ পরস্পরকে বলিয়া দ্বিপদবিশিষ্ট বার্ত্তাবহের কার্য্য করে।

ভোলাদাদা সেই প্রাচীন পাঠগৃহে সত্যযুগের ধূলার মধ্যে শুইয়া গড়াইতে গড়াইতে প্রাচীন পুস্তক পাঠ করেন, এবং সকল কথাই ভুলিয়া যান—কিন্তু কামাখ্যার পরিণাম ও হেমলতা মৃত্যুর কথা ভুলেন নাই, বুঝি ইহজন্মে ভুলিবেন না।

